রাতজাগা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২, কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

করকমলে

স্থচীপত্র

পরিচয়	...	১
জীবন্ত-প্রেত	...	২৯
দামোদরে বৈতরণী-পার	...	৫৩
উট-রোগ	...	৬৯
বর্ষা-দিনের কাব্য	...	৯৭
রাতজাগা	...	১২৫

পরিচয়

অর্থনীতি এবং অঙ্কশাস্ত্রের একটা কঠিন পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে শক্তিনাথ কলিকাতার কাস্টম হাউসে একটা মোটা মাহিনার চাকরি লাভ করবার পর মাতা সৌদামিনী জিদ ধ'রে বসলেন যে, এর পরও বিবাহের প্রস্তাবে পুত্র অসম্মতি প্রকাশ করলে সত্যসত্যই তিনি রাগ করবেন।

একটু ইতস্তত ক'রে শক্তিনাথ স্মিতমুখে বললে, "বেশ ত মা, তোমার আশীর্বাদে যখন মোটা ভাত-কাপড়ের একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছি, তখন তোমার অবাধ্য না হ'লে বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। তোমার আদেশ পালন করব।"

ভাত-কাপড়ের যুক্তিটা একদিক থেকে বস্তুত কোনো সময়েই তেমন সারবান ছিল না, কারণ শক্তিনাথের পিতা যে-অর্থ এবং সম্পত্তি রেখে পরলোক গমন করেছিলেন তাতে শক্তিনাথের উপার্জ্জনের অর্থ যোগ না হ'লেও শুধু মোটা ভাত-কাপড়ই বা কেন, মিহি ভাত-কাপড়ের সমস্যাও অবলীলাক্রমে সমাধান হ'তে পারত। কিন্তু সৌদামিনী সে

কথা তুললে শক্তিনাথ উত্তর দিত, "সে কথা ত ঠিকই মা। কিন্তু ও টাকা ত আমার নয়, ও টাকা তোমার। বাবা সমস্ত সম্পত্তির ষোল আনাই তোমাকে উইল ক'রে দিয়ে গেছেন শুধু সেই জন্যেই নয়, উইল না ক'রে গেলেও বাবার টাকাতে ষোল-আনা অধিকার তোমারই থাকত, এই আমি বুঝি। বাবা মারা গেলে টাকা হবে আমার, আর তুমি আমার কাছে থেকে মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন পাবে—আদালতের এ আইন আমার আইন নয়।"

এ কথার উত্তরে সৌদামিনী হয়ত বলতেন, "তা বেশ ত শক্তি, আমি দানপত্র ক'রে সমস্ত বিষয় তোকে লিখে দিচ্ছি, তুই নে। তা হ'লে ত তোর আর কোনো আপত্তি থাকবে না।"

উত্তরে শক্তিনাথ হাসিমুখে বলত, "তা হ'লে আপত্তি আমার চার গুণ বেড়ে যাবে মা। সুপুত্তুর না হই, কিন্তু বাবার আমি এমন কুপুত্তুর নই যে, যে-বিষয় তিনি উইল ক'রে তোমাকে দিয়ে গেছেন, ছলে-ছুতোয় দানপত্র লিখিয়ে নিয়ে তা থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব। যে স্নেহের দান তোমার কাছ থেকে পাচ্ছি তার কাছে বিষয় ত তুচ্ছ। তা ছাড়া, তুমি জান ত মা, সাধু ব্যক্তিরা বিষয়কে বিষ ব'লে নিন্দে ক'রে গেছেন।" ব'লে শক্তিনাথ উচ্চহাস্য ক'রে উঠত।

মাতা বলতেন, "এ তোর অভিমানের কথা শক্তি!"

শক্তি বলত, "কখনই নয় মা। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারই ক'রে নিই যে, বাবার উপর আমার হয়ত কিছু অভিমান আছে, কিন্তু তোমার উপর যে এক বিন্দুও নেই তা একেবারে সত্যি। তা যদি থাকত তা হ'লে দিনের পর দিন এমন নিশ্চিন্ত মনে একজন আইবুড়

মেয়ের মতো তোমার কাছ থেকে খোরপোশ আদায় করতে পারতাম না। যতদিন না নিজে উপার্জন করতে পারছি ততদিন তোমার পয়সা খেতে আমার কোনো অপমান নেই মা, কিন্তু তাই ব'লে একটা দানপত্র করিয়ে নিয়ে তোমার পয়সা নিজের ইচ্ছামতো ভোগ ক'রে আত্মসম্মান চরিতার্থ করব, এমন হীন মাতৃগর্ভে আমার জন্ম হয় নি।"

পুত্রের এই সকল কথারই ভিতরে ভিতরে সৌদামিনী অভিমানের ভাষ্য পাঠ করতেন। শক্তিনাথকে তিনি চিনতেন এবং সেজন্য জানতেন যে, তাঁর উপর অভিমানের কোন কারণ না থাকলেও স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর তার নিস্পৃহা চিরদিন বর্তমান থাকবে, এবং সেজন্য তাঁর নিজের হাত থেকেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক কপর্দকও কোনো দিনই সে গ্রহণ করবে না। এ কথা তিনি সেই দিনই বুঝেছিলেন যেদিন তাঁর স্বামী শক্তিনাথকে ডেকে বলেছিলেন— 'শক্তি, আমার যা কিছু সম্পত্তি সমস্তই তোমার মার নামে উইল ক'রে দিয়ে গেলাম',—এবং উত্তরে শক্তিনাথ বলেছিল, 'এ বিষয়ে আমার একমাত্র প্রার্থনা বাবা, তোমার উইলে আমাকেও সাক্ষী ক'রে সই করিয়ে নাও। তোমার উইলে আমার আনউইলিংনেস্ নেই—ওর মধ্যে এই প্রমাণটুকু আমার হাতের অক্ষরে লেখা থাকলে আমার মনে আর কোনো ক্ষোভই থাকবে না।'

কি কারণে শক্তির পিতা শক্তির মতো অমন মেধাবী পুত্রকে বঞ্চিত ক'রে স্ত্রীর নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন, কৌতূহলোদ্দীপক হ'লেও এ আখ্যায়িকার পক্ষে অবান্তর ব'লে সে কথার এইখানেই শেষ।

পুত্রের মুখে বিবাহে সম্মতির কথা শুনে সৌদামিনী আনন্দিত হ'য়ে বললেন, "তবে আমি শিবানীর সঙ্গে তোর বিয়ের পাকা কথা ক'য়ে ফেলি শক্তি। এই মাঘ মাসেই।"

শক্তিনাথ সবিস্ময়ে বললে, "শিবানী আবার কে মা?"

সৌদামিনী বললেন, "ওমা, শিবানীকে একেবারে ভুলে গেলি? ভবনাথ মুখুজ্জের মেয়ে—শিবানী। গেল বোশেখ মাসে শিলং যাবার পথে আমাদের বাড়ীতে ঘণ্টা কয়েকের জন্যে কাটিয়ে গিয়েছিল। নন্দীহাটের ভবনাথ মুখুজ্জে,—বর্ধমানের উকিল।"

শক্তিনাথের মনে পড়ল। বললে, "মনে পড়েছে মা। অনেক দিনের কথা কি-না, ভুলে গিয়েছিলাম।"

"অনেক দিনের কথা কি রে? এই ত মাস কয়েকের কথা। কেন, শিবানীকে ত তোর ভাল লেগেছিল শক্তি?"

"ভালকে ভাল লাগবে না কেন মা? ভালই লেগেছিল। কিন্তু তুমি সেখানে কোন রকম কথা দাও নি ত?"

প্রশ্নের ভঙ্গীর মধ্যে শিবানী সম্বন্ধে যে অকথিত আপত্তি প্রচ্ছন্ন ছিল তা উপলব্ধি ক'রে সৌদামিনীর মুখের প্রসন্ন ভাব অন্তর্হিত হ'ল; বললেন, "তোর মত না পেলে কথা দোব কোন্ সাহসে শক্তি? কিন্তু তারা তাদের কথা দিয়ে ব'সে আছে তোর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপেক্ষায়।"

সৌদামিনীর কথা শুনে শক্তিনাথের মুখে বিহ্বলতার লক্ষণ দেখা দিলে ; কিন্তু পরক্ষণেই নিঃশব্দ সলজ্জ হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল ; বললে, "মা, আমি একটা অপরাধ করেছি, তোমাকে কিন্তু ক্ষমা করতে হবে।"

সকৌতূহলে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই আবার কি অপরাধ করলি শক্তি ?" তারপর নির্বাক্ শক্তিনাথের লজ্জা-বিমূঢ় মুখ লক্ষ্য ক'রে সহসা বললেন, "ও ! তুই বুঝি কোথাও কথা দিয়েছিস তা হ'লে ?"

শক্তিনাথ বললে, "আমি কেন কথা দোব মা ? কথা তুমিই দেবে। তবে তোমার প্রতি আমার একান্ত প্রার্থনা ওইখানেই কথা দিয়ো।"

এ কথা-দেওয়ার মূল্য যে কি, তা অনুভব করবার মতো চেতনার অভাব সৌদামিনীর ছিল না। মুখের ভাবের মধ্যে একটু কাঠিন্য দেখা দিল ; কুশাগ্র-সূক্ষ্ম একটা অভিমান, কোথায় কেমন ক'রে তার উৎপত্তি তা ঠিক বোঝা যায় না, মনের এক কোণে একটু একটু বিঁধতে লাগল। বললেন, "ওখান কোন্খান তা ত আমি জানি নে শক্তি।"

শক্তিনাথ বললে, "বরিশালের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট্ বিনোদ চাটুজ্জের মেয়ে।"

"তোর সঙ্গে জানাশুনো হ'ল কোথায় ? কলকাতায় ?"

"হ্যাঁ।"

"এখানে কি করে ? পড়ে ?"

"না, পড়ায়।"

"পড়ায় ? কোথায় পড়ায় ? স্কুলে ?"

"কলেজে।"

"কলেজে? কি পাস করেছে?"

"ইংরিজীতে এম্. এ.।"

"বয়েস কত রে? তোর চেয়ে ছোট ত?"

মৃদু হেসে শক্তিনাথ বললে, "হ্যাঁ মা, ছোট। তবে খুব বেশি নয়, বছর দেড়েকের ছোট।"

"মাইনে পায় কত?"

"দু শো টাকা।"

সৌদামিনী বললেন, "তা মন্দ কি? তবে বিয়ের জন্যে তোর চাকরি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবার কি দরকার ছিল শক্তি? দু শো টাকাতে তোদের দুজনের এক রকম চ'লে যেতে পারত।"

সৌদামিনীর কথা শুনে শক্তিনাথের মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল; বললে, "এমন কথা তুমি রাগ ক'রেও আমাকে ব'লো না না। তোমার অর্থে মানুষ হচ্ছি ব'লে তুমি কি আমাকে এমনি অমানুষ ভাবো যে স্ত্রীর অর্থেও আমি মানুষ হ'তে পারি?"

সৌদামিনী বললেন, "এ শাস্ত্র তুই কোথায় পেলি রে শক্তি যে, স্ত্রীর অর্থে মানুষ হ'লে অমানুষ হ'তে হয়? এত অপরাধ বেচারা স্ত্রী কখন করলে?"

শক্তিনাথ বললে, "তা জানি নে মা, কিন্তু তুমি রাজী আছ কি-না বল।"

মৃদু হেসে সৌদামিনী বললেন, "হিন্দীতে একটা কথা আছে যে,

দুলহা দুলহিন রাজি তো কেয়া করেগা কাজী? তোরা দুজনে যখন রাজী ত আমি নারাজ কেন হব?"

ব্যগ্রকণ্ঠে শক্তিনাথ বললে, "মন খুলে বলতে হবে মা, তুমি রাজী কি-না! অভিমানের সুরে বললে চলবে না।"

পুত্রের কথায় সৌদামিনী হেসে ফেললেন; বললেন, "শোন কথা! অভিমানের সুর আবার কোথায় পেলি? আচ্ছা, আচ্ছা, আমি রাজী।" এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়েটির নাম কি রে শক্তি?"

শক্তিনাথ বললে, "তমিস্রা। তমিস্রা চ্যাটার্জি।"

সৌদামিনী বললেন, "বেশ নাম। বেশ নতুন ধরনের।" মনে মনে বললেন, তমিস্রা তা বুঝতেই পেরেছি! এখন সংসারটিকে নিজের ছায়া দিয়ে একেবারে না ঢাকলে বাঁচি!

মার্চ মাসেই তমিস্রার সঙ্গে শক্তিনাথের বিবাহ হয়ে গেল। বধূ এলে সৌদামিনী তাকে সাদরে বরণ ক'রে নিলেন। মনের মধ্যে একটু যে উৎকণ্ঠা, এম্. এ. পাস করা মাসিক দুই শত টাকা বেতন-গর্বিতা বধূর বিষয়ে একটু যে ত্রাস ছিল, তমিস্রার হাস্যপ্রফুল্ল সুন্দর মুখ দেখে অনেকখানিই তার লাঘব হ'ল। কাজকর্মের ফাঁকে এক সময় বধূকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ বউমা, বিয়ের জন্যে কলেজ থেকে কত দিনের ছুটি নিয়েছ ?"

তমিস্রা বললে, "ছুটি ত নিই নি মা। বিয়েতে আপনার সম্মতি পাবার পর আর কলেজে যাই নি, রেজিগ্‌নেশন দিয়ে দিয়েছি।"

বিস্মিতকণ্ঠে সৌদামিনী বললেন, "দু শো টাকার চাকরিটা একেবারে ছেড়ে দিলে বউমা ?"

তমিস্রা স্মিতমুখে বললে, "চাকরিতে আর দরকার কি মা ? এখন ত আপনাদের কাছে পাকা আশ্রয় পেয়েছি। এখন আপনাদের খাব, পরব।"

"কিন্তু বিয়ের আগেও ত তোমার অভাব ছিল না, তোমার বাবা ত মোটা মাইনের চাকরি করেন। তখন কেন চাকরি নিয়েছিলে ?"

তেমনি হাসিমুখে তমিস্রা বললে, "বাপের বাড়ির আশ্রয় ত

মেয়েদের চিরকালের আশ্রয় নয় মা। শ্বশুরবাড়ির দুঃখ-কষ্ট গায়ে লাগে না, কিন্তু বাপের বাড়ির অনাদর অবহেলা সহ্য করা শক্ত। তাই চাকরিটা সহজে পেয়েছিলাম ব'লে ছাড়ি নি। কিন্তু পাকা আশ্রয় পাবার পর আর ছাড়তে দেরি করি নি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্যায় করেছি কি মা?"

অন্যায় ত দূরের কথা, চাকরি ছাড়ার কথা শুনে সৌদামিনী মনের একটা দিকে একটু নিশ্বাস ছেড়ে হালকা হয়েছিলেন। পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে যে পুত্রবধূও গাড়ি চ'ড়ে অর্থোপার্জন করতে ছুটবেন না, সংসারের এই সহজ শিষ্ট মূর্তি স্মরণ ক'রে তিনি মনে মনে বধূর নিকট একটু কৃতজ্ঞই হলেন। বললেন, "না, না, অন্যায় কেন? তবে টাকাটাও ত নিতান্ত কম নয়,—হঠাৎ ছেড়ে দিলে,—তাই বলছি।"

তমিস্রা নম্রকণ্ঠে বললে, "তা ছাড়া আরো একটা কথা ভেবেছিলাম মা। আমার ত আর টাকার কোনো অভাব রইল না, কিন্তু এমন বিধবা অথবা অবিবাহিত স্ত্রীলোক আছেন যাঁদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, আমি চাকরি ছাড়লে তাঁদের মধ্যে একজন সেটা পেতে পারেন। পেয়েছেনও তেমনি একজন।"

মনে মনে বধূর কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রে প্রসন্নমুখে সৌদামিনী বললেন, "ভালই করেছ বউমা, আমি এতে খুশিই হয়েছি।"

কিন্তু এ সবই গেল বিবাহকালের কথা। উৎসবের দিনে সকলেরই কথাবার্তা চালচলন এমন একটা পর্যায়ে চলে যে, সে সময়ে লোকের স্বরূপ ঠিক ধরা যায় না। উৎসবের বাঁশী যখন থামল, সংসার যখন তার নিত্যকার সহজ কর্মানুবর্তিতায় ফিরে এল, তখন তার মধ্যে সৌদামিনী তমিস্রার যে মূর্তি দেখতে পেলেন তাতে তাঁর মনের স্থৈর্য একটু বিচলিত হ'ল। মনে হ'ল, সংসারের পর্দায় হয়ত তাঁর সুরের সঙ্গে তমিস্রার সুর ঠিকমত মিড়বে না,—হয়ত উভয়ের মধ্যে এমন একটু প্রভেদ বর্তমান থাকবে যাতে একটা বিবাদী কর্কশ শব্দই উৎপন্ন হবে।

এই রকমই মনে হয়, অথচ এর কম মনে করবার এমন কোনো প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায় না যা সহজে ধরা-ছোঁয়া যায়। সমস্তটাই যেন অনুমানের নীহারিকার মধ্যে অস্পষ্ট, কিন্তু অস্তিত্ব যে তার আছে তা চোখে দেখা না গেলেও মনে অনুভব করা যায়। তমিস্রার মুখে হাস্য, বাক্যে সংযম, আচরণে শ্রদ্ধা; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার যে সব সময়েই একটা স্বাধীন মত স্বাধীন সত্তা আছে তাও এই সবেরই মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তার অভিমত সৌদামিনীর অভিমতকে কখনো অতিক্রম করে না, কিন্তু সব সময়েই পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়। কখনো কখনো তার মত সৌদামিনীর মতের মধ্যে নিমজ্জিত হয়; কিন্তু

তখনো তার মধ্যে তমিস্রার ব্যক্তিত্বের অপরিচয় থাকে না, মনে হয় ইচ্ছা ক'রেই সে নিজের মতকে অগ্রসর হ'তে দিলে না, পরাজিত করলে।

এর ফলে ক্রমশ যেন তমিস্রা সংসারের কর্মকেন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হ'তে লাগল এবং সৌদামিনী রত্নবেদিকার ধাপে উঠতে লাগলেন। সে রত্নবেদিকায় শ্রদ্ধা আছে, সেবা আছে, হয়ত খানিকটা ভালবাসাও আছে,—কিন্তু এমন দুঃসহ কর্মহীনতা আছে যা আত্মাকে পীড়ন করে। রত্নবেদীর উপর নিয়মিতভাবে ফুল-বিল্বপত্র পড়ে, ভোগও চড়ে,—কিন্তু তার আয়োজনের স্থল নীচে, যেখানে কর্মের স্রোত প্রবাহিত। তমিস্রা বলে, 'তুমি ত এতদিন সংসারকে চালনা করলে মা, এবার আমাদের হাতের সেবা গ্রহণ কর।' কিন্তু কে চায় অন্তরের সঙ্গে সেই হাতের সেবা, যে-হাত কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়ে অবসর দিতে চায়! সৌদামিনীর মনে পুনরায় কুশাগ্রসূক্ষ্ম অভিমান দেখা দিল।

সাধারণ অবস্থায় হয়ত ঠিক এতটাই হয় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রের কথা একটু স্বতন্ত্র। স্বামীর সম্পত্তি উপলক্ষ্য ক'রে, শুধু পুত্রেরই নয়, সৌদামিনীর নিজের মনেও অভিমানের যন্ত্রটি ক্রমশ এমন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল যে, সূক্ষ্ম অনুভূতিবিশিষ্ট ভূকম্পমান যন্ত্রের মতো সামান্য নাড়াতেও তার মধ্যে সাড়া প'ড়ে যেত। এমনই কি গুরুতর অপরাধ হয়েছে রে বাপু, যে মার হাত দিয়েও সে সম্পত্তির কণামাত্র গ্রহণ করা চলে না। পুত্র হ'য়ে আইবুড় মেয়ের মতো লালিত-পালিত হওয়া, সেই সম্পত্তির প্রতি বিদ্বেষ ও বৈরাগ্যকে প্রকট ক'রে তোলা ছাড়া আর কিছুই নয়। মনে হ'ল, পুত্রবধূও এসে সমস্ত অবগত

হ'য়ে পুত্রের সুরেই সুর মেলাবার উপক্রম করছেন। চিরন্তনী পুত্র-বধূর প্রতি চিরন্তনী শাশুড়ীর এ অবচেতন ঈর্ষার কথা কি-না তা বলা যায় না, কিন্তু মনে হ'ল মার হাত থেকে লালনপালনটুকুও তিনি তুলে নিতে চান। পুত্রের প্রতি অভিমান, সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ঘনীভূত হয়ে এল। মনে হ'ল, প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এখন মানে মানে স'রে পড়াই ভাল। আগেকার কালে এই কারণেই লোকে পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যেত। পরে বনবাসের পরিবর্তে কাশীবাসের প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। সৌদামিনী কাশী যাওয়াই স্থির করলেন, এবং সে বিষয়ে দ্বিধা এবং বিলম্ব করবেন না মনে মনে তাও স্থির ক'রে ফেললেন।

কথাটা শুনে শক্তিনাথ প্রথমে পরিহাস ব'লে উড়িয়ে দিলে, তারপর প্রবল ভাবে আপত্তি তুললে, তারপরে রাগারাগি করলে, সর্বশেষে অভিমান ক'রে চুপ হ'য়ে গেল।

তমিস্রা বললে, "মা, তুমি আমার ওপর রাগ ক'রে বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাচ্ছ?"

সৌদামিনী হাসিমুখে বললে, "তোমার ওপর রাগ করব কেন বউমা তুমি ত কোনো দোষই কর নি।"

তমিস্রা বললে, "জেনেশুনে কোনো দোষ করি নি ব'লেই ত মনে হয়। তা হ'লে অদৃষ্টেরই দোষ বলতে হবে। কিন্তু এতে আমার ভারি একটা দুর্নাম র'টে যাবে মা। সকলে বলবে, এমন বউ এল যে ছ মাসও শাশুড়ী টিঁকতে পারলে না।"

সৌদামিনী বললেন, "যারা তোমাকে দেখেছে তারা কেউ সে কথা বলবে না বউমা। যারা দেখে নি তারা জানে সংসারের রীতি চিরদিনই এই হ'য়ে আসছে,—একজন আসে, আর আর-একজন চ'লে যায়। আজ বাড়ি ছেড়ে কাশী যাচ্ছি, আবার একদিন কাশী ছেড়েও আরো দূরে চ'লে যেতে হবে। সেদিন ত কোনোমতে ঠেকাতে পারবে না বউমা।"

শক্তিনাথ বললে, "একটা কাজ করা যাক মা, বাড়িটার মাঝখানে

একটা পাঁচিল গাঁথিয়ে দেওয়া যাক। তুমি থাক দক্ষিণ দিকের অংশে, আমরা থাকি উত্তর দিকে। টাকাকড়ি লোকজন সবই ত তোমার আছে, কোনো অসুবিধে হবে না।"

সৌদামিনী মনে মনে বললেন, চোখে দেখা যায় না ব'লে কি সে পাঁচিল পড়তে বাকি আছে! মুখে বললেন, "তুই রাগ করিস নে শক্তি, একদিন আমার মুখে তোকেই ত আগুন দিতে হবে বাবা। তাই যখন সহ্য করতে হবে তখন সামান্য কাশী যাওয়ার কথা শুনে এত অধীর হচ্ছিস কেন চিরকালই কি ইহ নিয়ে থাকব? পরকালের পথটা কি একবারও খুঁজে দেখতে হবে না?"

শক্তিনাথ বললে, "কাশীতে গলি-ঘুঁজি এত বেশি যে, তার মধ্যে পরকালের পথ খুঁজে পাওয়া সহজ হবে ব'লে মনে হয় না।"

সৌদামিনী স্মিতমুখে বললেন, "বিশ্বেশ্বর দয়া করলে শক্তও হবে না শক্তি।"

শক্তিনাথ বললে, "কাশীধাম না হয় বিশ্বেশ্বরের রাজধানী হ'ল, তাই ব'লে কি কলকাতা পর্যন্তও তাঁর দয়া পৌঁছবে না? ভারতেশ্বর থাকেন সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে ইংল্যাণ্ডে, কিন্তু তাই ব'লে তাঁর প্রভাব ত এখানে কিছু কম দেখি নে!"

শক্তিনাথের কথা শুনে সৌদামিনীর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল; বললেন, "ভাগ্যে এই উদাহরণটা দিলি, তাই তোকে বোঝানো সহজ হবে। এখানে প্রভাব যদি সমানই হবে তা হ'লে তোর বাপ খলসে-কুটি তালুকের মামলা এখানে হাইকোর্টে হেরে বিলেতে আপীল করলেন কেন, আর সেখানে আপীল জিতলেনই বা কেমন ক'রে. ও-কথা

তোর ঠিক নয় শক্তি, মফস্বলের চেয়ে শহরের প্রভাব একটু বেশি আছেই বইকি—স্থান-মাহাত্ম্য মানতেই হবে। কিন্তু এ-সব বাজে কথা যাক্, তুই আমাকে কাশীবাস করবার ব্যবস্থা ক'রে দে বাবা, আমার পরকালের মঙ্গলে বাধা দিস নে। কাশী ত এখন আর আগেকার মতো চার মাসের পথ নয়—এক রাত্রির মামলা—মাঝে মাঝে গিয়ে আমাকে দেখে-শুনে আসিস।"

এইরূপ তর্ক-বিতর্কে আরও কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর শক্তিনাথ যখন দেখলে যে, সৌদামিনী কাশী যাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন, কিছুতেই সে সঙ্কল্প থেকে তাঁকে বিচ্যুত করা যাবে না, তখন অগত্যা মাতার কাশীধাম যাতে সাধ্যমতো অসুবিধাজনক না হয় সে-বিষয়ে উদ্যোগী হ'ল। সাবেক আমলের সরকার বেণী ঘোষকে কাশী গিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন হাওয়াদার বাড়ি ভাড়া করবার জন্য আদেশ দিলে। বাড়ি ভাড়া হ'য়ে গেলে চুনকাম করিয়ে দরজা-জানলায় রঙ দিইয়ে ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার ক'রে সংবাদ দিলে সে সৌদামিনীকে কাশী পৌছে দিয়ে আসবে স্থির করলে। এ কথাও ব'লে দিলে যে, গৃহস্থালীর যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেন ক্রয় করা থাকে, যাতে পৌছে সৌদামিনীকে কোনোদিক দিয়ে কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করতে না হয়।

অদূরেই সৌদামিনী দাঁড়িয়ে ছিলেন, পুত্রের কথা শুনে নিকটে এসে বললেন, "কতকগুলো অদরকারী জিনিসপত্র কিনে অনর্থক আমাকে বিব্রত করবেন না সরকার মশায়, আমি ফর্দ ক'রে দেবো ঠিক সেই মতো কিনবেন। আর দেখুন, খুব হাওয়াদার বাড়ি না হ'লেও আমি দম আটকে মরব না, কিন্তু দু বেলা হেঁটে হেঁটে যাতে মরতে না হয় সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন, মন্দিরের যত কাছাকাছি হয় বাড়ি ভাড়া করবার চেষ্টা করবেন।"

সৌদামিনীর কথা শুনে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে শক্তিনাথ বললে, "তুমি সেখানে দু বেলা হেঁটে হেঁটে মন্দিরে যাবে না-কি মা ?"

"না, তা কেন যাব ? তুই সেখানে গিয়ে একটা চতুর্দোলা করিয়ে দিস, তাই চ'ড়ে মন্দিরে যাব।"—ব'লে সৌদামিনী হাসতে লাগলেন।

বেণীমাধব বললে, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন মা, আমি সব দিকে দৃষ্টি রেখে বাড়ি করব—কোনো অসুবিধা হবে না।"

দু-তিন দিনের মধ্যে টাকাকড়ি নিয়ে বেণী ঘোষ কাশী রওনা হ'ল, এবং দিন দশেক পরে তার কাছে থেকে চিঠি এল যে, সেখানকার সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ।

শুভদিন নির্ণয়ের নিষ্ঠার আতিশয্য শক্তিনাথের হঠাৎ এমন বেড়ে গেল যে, দিন পনেরোর পূর্বে ভাল যাত্রিক দিন কিছুতেই পাওয়া গেল না। যাওয়াই যখন হচ্ছে তখন কয়েকটা দিনের জন্য সৌদামিনী আর আপত্তি করিলেন না,—মনে মনে নিজেও বোধ হয় একটু খুশিই হলেন।

কাশী যাত্রার তখন তিন দিন বিলম্ব আছে, হঠাৎ প্রাতঃকালে বরিশাল থেকে তমিস্রার একটি বাইশ-তেইশ বৎসরের ভাই এসে হাজির,—নাম তার সুবিনয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল যে, সুবিনয়ের আকস্মিক আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য—সেই দিন বৈকালের গাড়িতেই তমিস্রাকে বরিশাল নিয়ে যাওয়া। এ কথাও জানতে বাকি রইল না যে, এ ব্যবস্থা তমিস্রা নিজে বরিশালে চিঠি লিখে করিয়েছে।

তমিস্রাকে দেখতে পেয়ে সৌদামিনী বললেন, "এ কি কাণ্ড বউমা!"

নিকটে এসে তমিস্রা বললে, "কি মা?"

"তুমি না-কি আজকের গাড়িতে বরিশাল যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, যাচ্ছি।"

"তিন দিন পরে আমি কাশী যাব, আর আজ তুমি বাড়ি ছেড়ে চললে বউমা?"

মুখ একটু গম্ভীর ক'রে তমিস্রা বললে, "সেই জন্যেই ত যাচ্ছি মা।"

"তার মানে?"

"তার মানে, এ বাড়িতে আমি রইলাম আর তুমি চ'লে গেলে—এ অবস্থাটা আমি সহ্য করতে পারব না; তাই তুমি এ বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে আমি চ'লে যাচ্ছি।"

"কিন্তু আমি চ'লে যাওয়ার পর আবার ত তুমি এ বাড়িতে আসবে বউমা?"

চক্ষু ঈষৎ বিস্ফারিত ক'রে তমিস্রা বললে, "ওমা, তা আবার আসব না? নিশ্চয় আসব। শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে কেউ আমাকে দূরে রাখতে পারবে না মা, তোমার কাশীর বিশ্বনাথও না।"

কাশীর বিশ্বনাথের উপর পুত্র এবং পুত্রবধূর আক্রোশ লক্ষ্য ক'রে সৌদামিনীর মনের এক কোণে কৌতুকের অন্ত ছিল না,—মুখে অতি ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত হ'ল। বললেন, "বোঝা গেল, কাশীর বিশ্বনাথ না হয় খুবই শক্তিহীন লোক, কিন্তু একটা কথা ত, ভাল ক'রে তলিয়ে দেখ নি বউমা, —আমি চ'লে যাওয়ার পর যেদিন তুমি ফিরে আসবে, সেদিন হয়ত লোকে বলবে—এমন বউ যে, শাশুড়ী বিদেয় হ'ল, তারপর ঘরে এসে ঢুকল।"

তমিস্রা বললে, "তা হয়ত বলবে, কিন্তু এ কথা ত বলতে পারবে না যে, এমন বউ যে দাঁড়িয়ে থেকে শাশুড়ীকে বিদেয় করলে।"

সৌদামিনীর মুখে পুনরায় হাসি স্ফুরিত হ'ল, বললেন, "তুমি এম. এ. পাস করা মেয়ে বউমা, তোমার সঙ্গে কি কথায় আমি পারি?—হার স্বীকার করলাম।"

তমিস্রাকে একান্তে পেয়ে শক্তিনাথ বললে, "এ কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি তমিস্রা।"

তমিস্রা বললে, "এ কথার প্রতিবাদ করছি নে।"

"মা ভারি ক্ষুণ্ণ হবেন কিন্তু।"

"ক্ষুণ্ণ হবার যন্ত্র ভগবান শুধু তাঁর মনেই বসান নি, আমার মনেও বসিয়েছেন।"

স্মিতমুখে শক্তিনাথ বললে, "বাপের বাড়ি যাওয়া সেই ক্ষোভের নন্-ভায়োলেণ্ট প্রোটেস্টের একটা ডিমনস্ট্রেশন না কি?"

তমিস্রা বললে, "তুমি ঠিকই বলেছ, এ আমার সত্যিই প্রোটেস্ট; কিন্তু ভারি ইন্‌ডিগ্‌ন্যাণ্ট প্রোটেস্ট।"

তামিস্রাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারা গেল না। সেই দিনেই সে বরিশাল চ'লে গেল। যাবার সময়ে গললগ্নবাস হ'য়ে শাশুড়ীকে প্রণাম ক'রে বললে, "অশিষ্ট মেয়ের অপরাধ নিয়ো না মা।"

পুত্রবধূর মস্তকে হস্তার্পণ ক'রে সহাস্যমুখে সৌদামিনী বললেন, "তুমি যখন নিষেধ করছ তখন না-হয় নোবো না।"

শিয়ালদহ স্টেশনে গাড়ি ছাড়বার পূর্বে শক্তিনাথ মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "কবে ফিরবে তামিস্রা?"

তমিস্রা তেমনি মৃদুস্বরে বললে, "তোমার চিঠি পেলেই।"

"সুবিনয়ই নিয়ে আসবে, না, আমাকে যেতে হবে?"

মৃদুস্মিত মুখে তমিস্রা বললে, "শ্বশুর-বাড়ির আদর-যত্নের জন্যে যদি লোভ হয়, তা হ'লে নিজেই যেয়ো,—নইলে সুবিনয়ই নিয়ে আসবে।"

কাশী যাবার দিন সৌদামিনী সকাল হ'তে সমস্ত দিনই কতকটা গম্ভীর হ'য়ে রইলেন। জলভারগুরু মেঘের মতো মন্থর গতিতে মাঝে মাঝে গৃহের মধ্যে ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন,—সব সময়েই যে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে, তা নয়,—অধিকাংশ সময়েই উদাস আত্ম-বিস্মৃত চিত্তে। চোখের সামনে শক্তিনাথের উদ্যোগে কাশী যাবার জিনিস-পত্র—সংখ্যা এবং আকারে অনাবশ্যকভাবে বেড়েই চলেছিল; কিন্তু সেদিন সে বিষয়ে সামান্য মাত্র আপত্তি করবার সামর্থ্য পর্যন্ত যেন সৌদামিনীর ছিল না,—'যা করে করুক' 'যা হয় হোক' এইরূপ একটা নিস্পৃহ নিরাসক্তি মনকে গভীর ভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল।

সন্ধ্যার পর শক্তিনাথ দুটি ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই ক'বে মালপত্র স্টেশনে পাঠিয়ে দিলে। তারপর ঘণ্টাখানেক পরে সৌদামিনীকে গিয়ে বললে, "মা, এবার আমাদের রওনা হবার সময় হয়েছে—আর দেরি করলে অসুবিধা হবে—"

দাস-দাসী-আত্মীয়-আশ্রিতের অশ্রু-বিলাপের মধ্যে বিদায়ের পালা শেষ ক'রে সৌদামিনী মোটরে গিয়ে বসলেন। গাড়ি ছাড়তে মুখ বাড়িয়ে একবার দ্রুতপলায়মান গৃহের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। মনে হ'ল, হয়ত এই শেষ! বহু সুখ দুঃখের স্মৃতিবিজড়িত স্বামীগৃহের সহিত হয়ত এইখানেই চিরদিনের মতো সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'ল।

পরদিন বেলা দশটার সময়ে বেনারস ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে গাড়ি পৌঁছলে বেণী সরকার দ্রুতপদে সৌদামিনীর কামরার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলে।

যুক্তকরে প্রতিনমস্কার ক'রে সৌদামিনী বললেন, "কি সরকার মশায়, আপনার শরীর ভাল আছে ত ?"

"আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি মা।"

"ঝি-চাকর ঠিক হয়েছে ?"

"হয়েছে মা।"

শক্তিনাথ বললে, "আর রাঁধবার লোক ? পদী পিসির সন্ধান পাওয়া গেছে ?"

সৌদামিনী বললেন, "তুই আর বেশি জ্বালাস নে শক্তি। চিরকাল স্বপাক খেয়ে এসে কাশীতে এসে পদী পিসি !"

শক্তিনাথ বললে, "কিন্তু এখানে তোমাকে সাহায্য করবে কে মা ?"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সৌদামিনী প্ল্যাটফর্মে নেবে পড়লেন। দুজন কুলি জিনিসপত্র নামিয়ে দিলে বেণীমাধব বললে, "এই জিনিস ত মা ? আর কিছু নেই ত ?"

সৌদামিনী বললেন, "তা হ'লে আর দুঃখ ছিল কি ? সতেরোটা জিনিস ব্রেক্‌ভ্যানে আছে।"

বেণীমাধব একটু চিন্তা ক'রে বললে, "সে-সব মাল ছাড়িয়ে গাড়িতে বোঝাই ক'রে নিয়ে যেতে ত সময় লাগবে মা। তার চেয়ে সঙ্গে যা জিনিসপত্র আছে তাইতে যদি এ বেলাটা কোনোরকমে চ'লে যায় তা হ'লে ও-বেলা আমি এসে মাল ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি।"

সৌদামিনী বললেন, "সঙ্গে যা জিনিসপত্র আছে তাতে আমার মণিকর্ণিকার দিন পর্যন্ত চ'লে যাবে। ব্রেক্‌ভ্যানের সমস্ত জিনিস যদি এইখান থেকেই শক্তির সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যায় তাতেও আমার কিছু অসুবিধে হবে না। কিন্তু সে কথা যাক, গঙ্গাস্নান সেরে মন্দির দর্শন ক'রে এসে দু-মুঠো রেঁধে ফেলতে না পারলে শক্তির ভারি কষ্ট হবে— জিনিস থাক্, আপনি এখন চলুন।"

শক্তিনাথ বললে, "সেই কথাই ভাল, ও-বেলা না-হয় আমিও আপনার সঙ্গে আসব সরকার মশায়। কিন্তু আপনি গিয়ে এখনি পদী পিসির সন্ধান করুন। পদী পিসি নইলে মার—"

শক্তিনাথকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সৌদামিনী ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলেন, "আরে, রেখে দে তোর পদী পিসির গল্প!" ব'লে ধাবমান কুলি দুজনের পিছনে দ্রুতপদে অগ্রসর হলেন।

একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে সকলে অবিলম্বে রওনা হলেন। দশাশ্বমেধের একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামতে সৌদামিনী বললেন, "এই বাড়ি না-কি সরকার মাশায়?"

বেণী ঘোষ বললে, "হ্যাঁ মা, এই বাড়ি।"

"চমৎকার বাড়ি ত! কিন্তু মিছিমিছি এত বড় বাড়ি করেছেন কেন?"

"খুব ছোট বাড়ি ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় না মা। তা ছাড়া দাদা-বাবুরা মাঝে মাঝে প্রায়ই এসে থাকবেন ত, একটু বড় বাড়ি না হ'লে অসুবিধা হবে যে!"

ভিতরে প্রবেশ ক'রে সৌদামিনী বললেন, "খাসা বাড়ি করেছেন সরকার মশায়,—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।"

শক্তিনাথ বললে, "হাওয়াদারও আছে।"

সম্মতিসূচক প্রসন্নকণ্ঠে সৌদামিনী বললেন, "হাওয়াদারও আছে।"

রান্নাঘরের নিকট উপস্থিত হ'য়ে সৌদামিনী একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, "ছ্যাঁক্‌ছোঁক্ ক'রে রান্নার শব্দ হচ্ছে, রাঁধছে কে সরকার মশায়?"

বেণী ঘোষ মাথায় হাত বুলিয়ে গুঁইগাঁই করতে লাগল। স্পষ্ট ক'রে কিছু বলে না।

বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে সৌদামিনী বললেন, "আঃ! সেই পদ্দী ঠাকুরঝিকে যোগাড় ক'রে এনেছেন! না, আমি আর পারি নে আপনাদের সঙ্গে। সে পেটরোগা মানুষ, নিজেকে সামলাতে পারে না—" তারপর হঠাৎ নিমেষের জন্য একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেয়ে বললেন, "না, এ তো পদ্দী ঠাকুরঝি নয়। কে এ তবে?"

পর-মুহূর্তেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে সেই স্ত্রীলোকটি বললে, "পদ্দী ঠাকুরঝি নয় মা, এ তোমার অবাধ্য মেয়ে তমিস্রা।" ব'লে সৌদামিনীর পদধূলি নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সৌদামিনী বিস্ময়ে ক্ষণকাল হতবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলেন; বললেন, "এ কি কাণ্ড বউমা? তুমি এখানে?"

তমিস্রা বললে, "আমিও কাশীবাস করব স্থির করেছি মা, তুমি করবে বিশ্বনাথের সেবা, আর আমি করব তোমার সেবা। দেখি, কার বেশি পুণ্য হয়!"

"তোমার বেশি পুণ্য হবে বউমা। বিশ্বনাথের বিচারেও তোমার

কাছে আমার হার হবে।" ব'লে সৌদামিনী বধূকে সবলে বক্ষের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। বেণী ঘোষের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "জিনিসপত্র আর স্টেশন থেকে এনে কাজ নেই সরকার মশায়। আজ রাত্রেই চলুন সকলে কলকাতা ফিরে যাই।" তারপর বধূকে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত ক'রে চিবুক চুম্বন ক'রে বললেন, "আমি তোমাকে চিনতে পারি নি বউমা।"

শক্তিনাথ বললে, "আমিও এতটা পারি নি মা।"

বেণী ঘোষ এগিয়ে এসে সোৎসাহে বললে, "পরশু দিন যখন বউমা এসে এ বাড়িতে পায়ের ধূলো দিলেন, আমি কিন্তু তখনি চিনতে পেরেছিলাম।"

হঠাৎ দেখা গেল—সকলেরই চক্ষে অশ্রু, শুধু তমিস্রার মুখে হাসি।

শক্তিনাথ বললে, "দশ দিন ছুটি যখন নিয়ে এসেছি তখন আজই কলকাতা না ফিরে এ অঞ্চলের কয়েকটা তীর্থ দর্শন ক'রে ফেরা যাক্।"

এ প্রস্তাবে সকলেই খুশি হ'ল, সকলের চেয়ে বোধ হয় তমিস্রা বেশি।

জীবন্ত-প্রেত

জানুয়ারি মাসের মাঝামঝি। তিন চার দিন হ'ল শীতটা আবার নূতন এক চোট চেপে পড়েছে। গতরাত্রি থেকে হঠাৎ আকাশভরা এক রাশ হাল্কা মেঘ এসে উপস্থিত, তদুপরি তীব্র কন্‌কনে পশ্চিমা হাওয়া। সুতরাং মোটের উপর ব্যাপারটা কিরূপ গুরু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়।

অবসরপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট এবং সেশন্‌স্ জজ রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় বেলা নটার সময়ে প্রাতর্ভ্রমণ এবং দুই-এক ঘরে মামুলি খোঁজ-খবর সমাপন ক'রে দানাপুরের রেল-পল্লীর একটি পরিচ্ছন্ন বাংলোয় প্রবেশ করলেন। তারপর গৃহ-সম্মুখের প্রশস্ত বারান্দায় উপস্থিত হ'য়ে লাঠি ও গাত্রবস্ত্রটা টেবিলের উপর ফেলে একটা ঈজি-চেয়ারে উপবেশন ক'রে ডাক দিলেন, "দাদু! দাদাভাই!"

আহ্বান পেয়ে গৃহের ভিতর হ'তে সাত-আট বৎসরের একটি গৌরবর্ণ বালক বেরিয়ে এসে বললে, "কি দাদাভাই? চা?"

সহাস্যমুখে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে প্রসন্নকুমার বললেন, "হ্যাঁ ভাই, চা।"

এ প্রশ্ন এবং উত্তর উভয়ই এক হিসাবে নিরর্থক। কারণ, প্রত্যহই এই সময়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন ক'রে প্রসন্নকুমার বেশ বড় এক পেয়ালা তপ্ত চা পান করেন। পুত্রবধূ সুবর্ণার ব্যবস্থায় প্রাতর্ভ্রমণে যাওয়ার সময় তাঁকে মিষ্টান্নাদির সহিত চায়ের পরিবর্তে হয় এক বাটি ঘন দুধ কিংবা

পূর্বরাত্রিতে প্রস্তুত ক্ষীর অথবা পায়েস খেয়ে যেতে হয়। শ্বশুরের শারীরিক পুষ্টিসাধনের দিক দিয়ে চায়ের প্রতি সুবর্ণার কিছুমাত্র আস্থা নেই। তার মতে ও বস্তুটা শুধু শীত ভোগ ক'রে আসার পর একটা দেহ-উত্তেজক জলীয় পদার্থরূপেই ব্যবহার করা চলে।

খবরের কাগজওয়ালার কাছ থেকে দৈনিক ইংরেজী সংবাদপত্রখানা প্রসন্নকুমার পথেই সংগ্রহ করেছিলেন। ঈজি-চেয়ারের হাতলের উপর পা দুটি লম্বা ক'রে মেলে দিয়ে তিনি সংবাদপত্রের মধ্যে মনোনিবেশ করলেন। চীনাদের প্রতি পাশবিক অত্যাচারের জন্য জাপানের বিরুদ্ধে মেজাজটা সবেমাত্র উষ্ণ হ'য়ে উঠছে, এমন সময়ে চায়ের পেয়ালা হস্তে সুবর্ণা প্রবেশ করল।

"বাবা!"

চোখ থেকে চশমাটা খুলে টেবিলের উপর রেখে প্রসন্নকুমার সুবর্ণার হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা গ্রহণ করলেন, তারপর এক চুমুক চা পান ক'রে সুবর্ণার দিকে চেয়ে বললেন, "বউমা, সন্তোষ কবে আসবে? শনিবারে, না, রবিবারে?"

মৃদুস্বরে সুবর্ণা বললে, "বোধ হয় রবিবারে।"

শুনে প্রসন্নকুমার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন; বললেন, "রবিবারে? তা হ'লে দেখছি, এ সপ্তাহেও আমার কানপুর যাওয়া হ'ল না!"

সুবর্ণা বললে, "আপনাকে বোধ হয় কানপুর যেতে হবে না বাবা।"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রসন্নকুমার বললেন, "যেতে হবে না? কেন বল ত? সন্তোষ মিনুকে নিয়ে আসবে না কি?"

"বোধ হয়।"

প্রসন্নকুমারের মুখ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল ; বললেন, "সে নিয়ে এলে ত বাঁচি। যা ঠাণ্ডা পড়েছে, বাড়ি ছেড়ে এক পা নড়তে ইচ্ছে করে না।"

সন্তোষ সুবর্ণার স্বামী, অর্থাৎ প্রসন্নকুমারের পুত্র। ঈস্ট ইণ্ডিয়ান রেলে সে অফিসার গ্রেডে চাকরি করে। সম্প্রতি টূরে বাহির হয়েছে।

ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রে সুবর্ণা বললে, "আর একটু চা নিয়ে আসব বাবা ?"

প্রসন্নকুমার বললেন, "না, আর দরকার নেই। সুধীরকে দিয়ে গোটা কয়েক লবঙ্গ পাঠিয়ে দিও।"

সুধীর সেই পূর্বোক্ত বালক—সন্তোষের একমাত্র সন্তান।

সুধীর যখন লবঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হ'ল, তখন ডাকপিওন চিঠি নিয়ে এসেছে। তিন-চারখানা চিঠির মধ্যে একখানা ছিল সুবর্ণার। সেই চিঠিখানা সুধীরের হাতে দিয়ে প্রসন্নকুমার বললেন, "এটা তোমার মাকে দাওগে ত ভাই।" তার পর দুরন্ত হাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি ঘরের ভিতরে গিয়ে বসলেন।

চিঠি নিয়ে সুধীর দ্রুতবেগে উধাও হ'ল, কিন্তু তিন-চার মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "দাদাভাই, চিঠি প'ড়ে মা মাটিতে শুয়ে কাঁদছে।"

ব্যস্ত হ'য়ে প্রসন্নকুমার উঠে দাঁড়ালেন। "কাঁদছেন ? কেন, কি হয়েছে ? কার চিঠি ?" তাড়াতাড়ি গৃহের ভিতর প্রবেশ ক'রে দেখলেন, সত্যই তাই, ভূমিতলে শয়ন ক'রে সুবর্ণা উচ্ছ্বসিত হয়ে রোদন করছে ; নিকটে ব'সে প্রসন্নকুমারের বিধবা ভগিনী বিরজা সুবর্ণার দেহে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন,—অদূরে পোস্টকার্ডখানা প'ড়ে রয়েছে।

চিন্তাকুল কণ্ঠে প্রসন্নকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে বউমা ? কি হয়েছে, বিরজা ?"

পোস্টকার্ডখানা তুলে নিয়ে প্রসন্নকুমারের হাতে দিয়ে বিরজা বললেন, "বউমার বাবা হঠাৎ মারা গেছেন।"

প্রসন্নকুমার চমকে উঠলেন, "সে কি সর্বনাশের কথা ! কি হয়েছিল ? কবে মারা গেছেন ?"

বিরজা এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না। কারণ, প্রসন্নকুমার তৎক্ষণে চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। তাড়াতাড়ি তিনি চশমাটা বাইরের ঘরে ফেলে এসেছিলেন, তাই হাতটা আগিয়ে দিয়ে পোস্টকার্ডখানা চক্ষু হ'তে যতটা সম্ভব দূরে রেখে পড়তে লাগলেন।

চিঠি লিখেছে, বৈবাহিক শম্ভুনাথের বিশ্বস্ত পুরাতন কর্মচারী সরসীলাল,—দূরসম্পর্কিত আত্মীয়তার গণনায় সে শম্ভুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। সংক্ষিপ্ত চিঠি। প্রথমেই লিখেছে, "কয়েকদিন হইতে হার্টের প্যালপিটেশনটা বাড়িয়া শম্ভুকাকা মহাশয় বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। তদুপরি একটা সামান্য কারণে রাগ এবং বকাবকি করিয়া কাল রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছেন। এ কারণ আমাদের মানসিক অবস্থার কথা বুঝিতেই পারিতেছ। তোমার জ্ঞাতার্থে লিখিলাম।" তারপর যে সংবাদ অবগত হওয়ার জন্য স্বর্ণা চিঠি লিখেছিল তার উত্তর, এবং তৎপরে মামুলি প্রথা অনুসারে চিঠির সমাপ্তি।

চিঠিখানা স্বর্ণার নিকটে স্থাপন ক'রে দুঃখবিগলিত কণ্ঠে প্রসন্নকুমার বললেন, "চিঠি যখন পাঠালাম, তখন তার মধ্যে যে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ ভরা আছে তা ত স্বপ্নেও মনে করি নি। মাঝে মাঝে বেহাই

মশায়ের হার্টের প্যাল্‌পিটেশন হয় তাই জানতাম; কিন্তু তাঁর ব্লাড-প্রেশারের গোলযোগও ছিল নাকি বউমা?"

ক্রন্দননিরুদ্ধ কণ্ঠে সুবর্ণা বললে, "বোধ হয় একটু ছিল।"

প্রসন্নকুমার বললেন, "বোধ হয় না, নিশ্চয়ই ছিল। এ ব্লাড-প্রেশারেরই কাণ্ড। ভারি বিশ্রী জিনিস, কখন যে হঠাৎ সাংঘাতিক হ'য়ে ওঠে, তা আগে থেকে একটুও বোঝা যায় না। তার ওপর রাগারাগি বকাবকি করেছিলেন,—তাতে ত প্রেশার এমনিই খানিকটা বেড়ে যায়।"

বিরজা বললেন, "সন্ন্যেস রোগের ধরনই ওই, একেবারে চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। মেজ-জেঠামশায়ের কথা মনে পড়ে না দাদা?—বেলা বারোটার সময়ে বকাবকি করতে করতে মাথা ঘুরে পড়লেন, তার পরে দুটোর মধ্যে সব শেষ হ'য়ে গেল! বেহাই মশায়েরও যে সন্ন্যেস রোগ হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বৈবাহিকের অতি আকস্মিক মৃত্যুর জন্য প্রসন্নকুমার গভীর দুঃখ এবং সমবেদনা প্রকাশ করলেন, তৎপরে মানব-জীবনের অসারতার কথা উল্লেখ ক'রে সুবর্ণাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। বললেন, "মানুষের পক্ষে নশ্বর দেহটা কিছুই নয়,—অবিনশ্বর যে আত্মা তাই তার আসল জিনিস। বেহাই মশায়ের সেই আত্মার যাতে কল্যাণ হয়, তুমি তাঁর সন্তান, তোমার এখন ধৈর্য ধ'রে সেই কর্তব্য পালন করাই উচিত। কাল তোমার সেই কর্তব্য করবার দিন। শোক করবার সময় কোথায় বউমা?"

বিরজা বললেন, "বাবা যে দিন মারা গেলেন, সেই রাত্রে আমি

স্বপ্নে দেখলাম, বাবা আমার মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে বলছেন—তুই কান্নাকাটি করিস নে বিরো, আমি ছেলেদের আগে তোর হাতেই জল পাব। তুই ধৈর্য ধর্।"

প্রসন্নকুমার বললেন, "আগা, সত্যই ত! 'আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ' হ'য়ে তিনি রয়েছেন, তোমার দ্বারাই প্রথম তাঁর সদ্গতি হবে। সময় অত্যন্ত অল্প; কিন্তু এরই মধ্যে আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি, যাতে কাজটি ক'রে তুমি মনের মধ্যে তৃপ্তি পেতে পার। শোক করবার অনেক সময় রইল বউমা, কিন্তু কাজ করিবার সময় বেশি নেই। তুমি ধৈর্য ধর।"

যুক্তি-বিচারের প্রভাবে সুবর্ণাকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হ'ল।

পরদিন চতুর্থী-কৃত্য। প্রসন্নকুমার কর্মপটু ব্যক্তি, অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা সুচারুরূপে সম্পন্ন করলেন। পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার দিলেন পুরোহিতের উপর, এবং স্বয়ং প্রত্যেক বাড়িতে উপস্থিত হ'য়ে দানাপুরের পরিচিত সকল বাঙালীকেই পরদিন সায়াহ্নে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে এলেন। মধ্যাহ্নে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থাও করলেন। পাটনা শহরেও কোন কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হ'ল।

সংবাদ পাওয়ার পর পরিচিত স্ত্রীলোকেরা দলে দলে সুবর্ণার সহিত দেখা করতে উপস্থিত হলেন। সকলেরই মুখে এক কথা, "আহা, কি চমৎকার লোকই না শঙ্করবাবু ছিলেন! এই পূজোর আগেও ত এখানে এসেছিলেন। যেমন মুনিঋষির মত চেহারা, তেমনি অমায়িক স্বভাব! কি শরীর! কি বর্ণ! কি দাড়ি!"

সুবর্ণার শোকের উচ্ছ্বসিত বেগ ক্রমশ অনেকখানি কেটে গেছে, কিন্তু সান্ত্বনাকারিণীদের সঙ্গে কথা কইতে গেলে চোখের জল কিছুতেই বাধা মানে না। কি কাণ্ডই না হঠাৎ হ'য়ে গেল! এমন কাল ব্যাধি এসে গ্রাস করলে যে, শেষ-মুহূর্তে একবার কাছে গিয়ে যে দাঁড়াবে, তার পর্যন্ত সময় পাওয়া গেল না!

সন্ধ্যাকালে অনেকগুলি ভদ্রলোক প্রসন্নকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করতে

এলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলেই আন্তরিক দুঃখিত। কারণ, সকলেরই সহিত শম্ভুনাথ পরিচিত ছিলেন। তিনি বহুবার দানাপুরে জামাতৃগৃহে বেড়াতে এসেছেন, এবং প্রত্যেকবারই তথায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত ক'রে গেছেন। শম্ভুনাথ রীতিমত ধনশালী ছিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্যের উত্তাপ তাঁর কিছুমাত্র ছিল না ; বরং স্বভাবত তিনি ছিলেন সঙ্গপ্রিয়, সদালাপী এবং কৌতুক-পরায়ণ ব্যক্তি। দাবার আড্ডায়, গান-বাজনার আসরে, আলোচনা-সভায়—সর্বত্র তাঁর অবাধ গতি ছিল। দূর হ'তে লোকে শম্ভুনাথের প্রাণখোলা উচ্চ হাস্য শুনতে পেয়ে তাঁর সঙ্গলোভে খুশি হ'য়ে উঠত।

মানব-জীবনের ভয়াবহ অনিশ্চয়তা, ইহলোক এবং পরলোকের অনুদ্ঘাটিত রহস্য, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিগূঢ় সম্বন্ধ প্রভৃতি সময়োচিত জটিল বিষয়াদির আলোচনার পর যখন সমবেদনা-সভা ভঙ্গ হ'ল, তখন রাত্রি আটটা বাজে। প্রস্থানোদ্যত ভদ্রলোকদিগকে প্রসন্নকুমার সনির্বন্ধে বললেন, "অনুগ্রহ ক'রে কাল সন্ধ্যার সময় আপনারা নিশ্চয় আসবেন। আপনাদের তিনি ভালবাসতেন, আপনারা এসে আহারাদি করলে বউমা তৃপ্তি পাবেন।"

প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল—সকলেই আসবেন।

পরদিন যথাবিধি চতুর্থী-কৃত্য সমাপন হওয়ার পর মধ্যাহ্নে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজন করানো হ'ল, এবং তারপর চলল রাত্রে জন চল্লিশ বন্ধুবান্ধবকে ভোজন করাবার আয়োজন।

তিন জন ব্রাহ্মণ রন্ধন করছিল, এবং প্রসন্নকুমার অদূরে একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে স্বয়ং তদারক করছিলেন। সুবর্ণা উপস্থিত হ'য়ে বললে, "বাবা, অনেকক্ষণ এখানে ব'সে আছেন, কষ্ট হচ্ছে। ঘরে চলুন, চা খাওয়ার সময় হয়েছে।"

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছিল, রন্ধনকার্যও সমাপ্তপ্রায়, শরীরও একটু পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিল। প্রসন্নকুমার বাইরের হল-ঘরে গিয়ে একটা ঈজি-চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিলেন।

অনতিবিলম্বে চা নিয়ে সুবর্ণা প্রবেশ করলে। সুবর্ণার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা গ্রহণ ক'রে প্রসন্নকুমার বললেন, "কাজটা তোমার মনের মত হ'ল ত বউমা?"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে সুবর্ণা বললে, "আপনার সুব্যবস্থায় খুব ভালই ত হয়েছে বাবা।"

"তা হ'লে মনের মধ্যে একটু শান্তি পেয়েছ ত?"

সুবর্ণার চোখ দিয়ে দুই বিন্দু অশ্রু ঝ'রে পড়ল; সে মৃদুস্বরে বললে, "তা পেয়েছি।"

"তা হ'লেই হ'ল। তা হ'লে তাঁরও মঙ্গল, তোমারও মঙ্গল, তোমার সংসারেও মঙ্গল। বাপ-মা চিরকাল কারো থাকে না বউমা, তবে শেষ সময়টায় দেখতে পেলে না—এই দুঃখই তোমায় র'য়ে গেল।"

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছে সুবর্ণা ধীরে ধীরে প্রস্থান করলে।

আকাশটা খুব মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে এসেছিল। টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করলে, বায়ুর প্রকোপও বেড়ে উঠল।

পশ্চিমা ভৃত্য কপুরী এসে জিজ্ঞাসা করলে, বারান্দার দিকের দরজাটা বন্ধ ক'রে দেবে কি-না!

জলো হাওয়ার ঝাপটা মাঝে মাঝে ঘরের ভিতর প্রবেশ করছিল। প্রসন্নকুমার বললেন, "এখন ত লোকেদের আসতে বিলম্ব আছে, এখন না হয় বন্ধ ক'রে দে, পরে খুলে দিলেই হবে।"

শুধু সার্সিটা বন্ধ ক'রে কপুরী খিল লাগিয়ে দিলে, তার পর প্রসন্নকুমারের কাছে এসে যথানিয়মে পা টিপতে বসল।

সুধীর নিকটেই কোথায় ছিল, পূর্বদিন থেকে মৃত্যু এবং শোকের এই অজ্ঞাতপূর্ব অভিজ্ঞতায় তার মনটা নানা দিক দিয়ে চিন্তাপীড়িত হ'য়ে ছিল। প্রসন্নকুমারকে একটু নিশ্চিন্ত অবস্থায় পেয়ে কাছে এসে সে ডাক দিলে, "দাদু!"

সুধীরের কাঁধে হাত রেখে স্নেহপূর্ণকণ্ঠে প্রসন্নকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, "কি দাদাভাই?"

"দাদামশাই এখন কোথায় আছে?"

"দাদামশায়? তোমার দাদামশায় এখন স্বর্গে আছেন।"

মনে মনে এক মুহূর্ত কি চিন্তা ক'রে সুধীর বললে, "সগ্‌গো থেকে এখানে আসতে পারে?"

এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়াব সময় পাওয়া গেল না, বারান্দার দিকের দরজার সার্সিতে টোকা মারার শব্দ পাওয়া গেল। ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে, বারান্দার আলো তখনও জ্বালা হয় নি, সেই আলো-অন্ধকারের অস্পষ্টতায় সার্সির উপর একটা ছায়াপাত হয়েছে। সম্ভবত কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি একটু আগেই এসেছেন মনে ক'রে প্রসন্নকুমার কপুরীকে দরজাটা খুলে দিতে আদেশ করালন। কপুরী দরজার হুড়কাটা একটুখানি খুলেই আবার তখনি চট্ ক'রে লাগিয়ে দিলে, তারপর আর একবার ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে "রাম! রাম! সত্যানাশ হুয়া।" ব'লে সত্রাসে কয়েক পা পিছিয়ে এল।

সুধীরও কপুরীর পিছনে পিছনে গিয়েছিল। কপুরীর ভয়চকিত ভাব দেখে কিছু বুঝতে না পেরে কৌতূহলী হ'য়ে দরজার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা নির্ণয় করবার চেষ্টা করলে, তারপর ক্ষণকাল নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকে "উ রে বাবা রে! সগ্‌গো থেকে দাদামশাই এসেছে!" বলে উঠি-ত-পড়ি ক'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির ভিতর ছুটে পালিয়ে গেল।

"ব্যাপার কি!" ব'লে প্রসন্নকুমার তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর সভীতিকৌতূহলে সার্সির কাছাকাছি গিয়ে ভাল ক'রে নিরীক্ষণ ক'রেই দু-পা পিছিয়ে এলেন।

আলো-অন্ধকারের আবছায়ায় সার্সির উপরে যে একরাশ কাঁচা-

পাকা দাড়ির সমাবেশ হয়েছিল তা যে বৈবাহিক শম্ভুনাথের, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। অস্পষ্ট মুখাবয়বের মধ্যে সমুজ্জ্বল চক্ষুর ভিতর ব্যগ্র বিচিত্র দৃষ্টি। কথার শব্দও একটু একটু শুনা যাচ্ছিল, কিন্তু বৃষ্টির চড়বড়ানি এবং কাচের বাধা অতিক্রম ক'রে এতই ক্ষীণ হ'য়ে আসছিল যে, অনুনাসিক কি-না তা ঠিক বুঝা যাচ্ছিল না।

সার্সির উপর সমানে আঙুলের ঠকঠকানি চলেছিল। প্রসন্নকুমার দ্বিধা-পীড়িত মনে একবার হুড়কার উপর হস্তার্পণ করলেন, তারপর কি মনে ক'রে হুড়কাটা ভাল ক'রে টিপে দিয়ে হাত সরিয়ে নিলেন। অনিচ্ছাক্রমেও তাঁর দেহে কাঁটা দিয়ে উঠছিল, এবং প্রচণ্ড শীতের দিনেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছিল।

গোলযোগ শুনে দ্রুতপদে স্থবর্ণা এসে উপস্থিত হ'ল এবং তাড়াতাড়ি সার্সির কাছে গিয়ে ভাল ক'রে একবার দেখেই "বাবা এসেছ!" ব'লে ফট্ ক'রে দরজা খুলে দিলে।

"কেমন আছ বাবা ?"

সশরীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন শম্ভুনাথ। এবং স্থবর্ণা ভিন্ন আর সকলেই এক-আধ পা পিছিয়ে দাঁড়াল।

শম্ভুনাথের পদধূলি গ্রহণ ক'রে ব্যগ্রকণ্ঠে স্থবর্ণা বললে, "কেমন আছ বল না বাবা ?"

বিস্ময়চকিত শম্ভুনাথের মুখে কথা ফুটল; বললেন, "সে কথা পরে বলছি, কিন্তু তোমাদের কি ভূতে পেয়েছে স্থবর্ণা ?"

উত্তর দিলেন প্রসন্নকুমার; বললেন, "না পেয়ে থাকলেই ত বাঁচি। কিন্তু কিছুক্ষণ ধ'রে সেই আশঙ্কাই হয়েছিল।"

সবিস্ময়ে শম্ভুনাথ বললেন, "কি রকম ?"

শম্ভুনাথের সহজ আকৃতি দেখে এবং স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনে প্রসন্নকুমার বুঝতে পেরেছিলেন, মৃত্যু-সংবাদের মধ্যে নিশ্চয় একটা কিছু গোলযোগ আছে। তিনি বললেন, "বস্থন, একবার ভাল ক'রে অনুভূতির দ্বারা পরীক্ষা ক'রে দেখি, তারপর বলছি।" ব'লে সজোরে দুই বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে শম্ভুনাথকে চেপে ধ'রে বললেন, "নাঃ—কঠিন, উষ্ণ, জীবন্ত। 'আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ' নয়। অতএব আশ্রয়ে অধিষ্ঠিত হন।" ব'লে তিনি শম্ভুনাথের দুই বাহু ধ'রে একটা চেয়ারের উপর বসিয়ে দিলেন।

শম্ভুনাথের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তিনি বিহ্বল নেত্রে ক্ষণকাল প্রসন্নকুমারের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর স্খলিতকণ্ঠে বললেন, "কি ব্যাপার বলুন দেখি বেই মশাই ?"

সংক্ষেপে প্রসন্নকুমার সমস্ত কথাটা ব'লে গেলেন—মায় আসন্ন ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা পর্যন্ত।

শুনে শম্ভুনাথ বিস্মিত নেত্রে বললেন, "কই, দেখি সরসীর চিঠি—আমার মৃত্যুর কথা কি সে লিখেছে !"

পাশের ঘর থেকে পোস্টকার্ডখানা এনে সুবর্ণা শম্ভুনাথের হাতে দিল। নিবিষ্ট ভাবে পোস্টকার্ডখানা পড়তে পড়তে হঠাৎ এক সময়ে শম্ভুনাথ উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। বললেন, "এ যে দেখছি 'আজ মর গিয়া'র দ্বিতীয় কাহিনী হ'ল! সে লিখেছে, কাল রাত্রে হঠাৎ তিনি আরা গিয়াছেন, আর তোমরা সকলে পড়েছ মারা গিয়াছেন! হার্টের প্যাল্‌পিটেশন রাগারাগি বকাবকি—এই সব উপসর্গের সঙ্গদোষে 'আরা' অতি সহজেই মারা হ'য়ে গেছে। তা ছাড়া জড়ানো লেখার জন্যে 'আরা'টা অনেকটা 'মারা'র মতো দেখাচ্ছে বটে।" ব'লে তিনি পুনরায় উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন—তাঁর সেই পেটেণ্ট হাসি, যা দানাপুরে সর্বজনের পরিচিত।

অপ্রতিভ প্রসন্নকুমার স্খলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি সত্যি-সত্যিই আরা গেছলেন না-কি বেই মশায়?"

শম্ভুনাথ বললেন, "সেইখান থেকেই ত এখন আসছি। অপর্ণার কাছে দিন তিনেক ছিলাম।"

অপর্ণা শম্ভুনাথের কনিষ্ঠা কন্যা।

হাস্য কৌতুক এবং আনন্দের একটা প্রবল প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল। কিন্তু শুধু তাই নয়, দেখা গেল অদূরে অশ্রু এবং রোদনেরও একটা পালা সমানে তাল রেখে চলেছে। একটা চেয়ারে ব'সে আনন্দে সুবর্ণা ফ্যাঁস ফ্যাঁস ক'রে অশ্রু মোচন করছে।

সুবর্ণার নিকটে উপস্থিত হ'য়ে তার মাথায় হাত রেখে শম্ভুনাথ বললেন, "কাঁদছিস্ কেন সুবর্ণা, ভালই ত করলি। আগেভাগেই সেরে রাখলি। পিতৃকার্যের আগাম কারবার আমিও নিজের চোখেই দেখে গেলাম। এমন কি তোর ব্রাহ্মণভোজনের একটা পাতে শরিক হ'তে পারব।" ব'লে পুনরায় হাসতে লাগলেন।

কৌতুকপ্রিয় শম্ভুনাথের মাথার মধ্যে হঠাৎ একটা খেয়ালের উদয় হ'ল; বললেন, "দেখুন বেই মশায়, এমন চমৎকার প্রহসনটার যবনিকা এখানেই শেষ করলে চলবে না—এর জের ব্রাহ্মণভোজন পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যেতে হবে।" ব'লে নিজের অভিসন্ধির কথাটা সংক্ষেপে প্রকাশ ক'রে বললেন।

ফন্দিটা সকলেরই নিকট অতিশয় কৌতুকপ্রদ ব'লে মনে হ'ল। যারা শম্ভুনাথের আগমনের কথা জানতে পেরেছিল, সকলকেই সে কথাটা একান্তভাবে গোপন রাখবার জন্যে ব'লে দেওয়া হ'ল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-বর্গকে আহ্বান-আপ্যায়নের জন্য প্রসন্নকুমার বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে বসলেন। গরম এককাপ চা এবং ব্রাহ্মণভোজনের জন্য প্রস্তুত দু-চার-খানা কড়াইসুঁটির কচুরির দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রে শম্ভুনাথ অভিনয়ের জন্য প্রবৃত্ত হলেন।

বাড়ির ভিতরে একটা দীর্ঘ দালানে নিমন্ত্রিতদের জন্য দুই সারি পাতা সাজানো হয়েছে, সেই দালানের এক প্রান্তে একটা চৌকোণা টেবিল স্থাপিত করা হ'ল। একটি বেশ বড় বাধানো ছবি থেকে ছবি এবং পিছনের পীজবোর্ড খুলে ফেলে শুধু ফ্রেম এবং কাচ হাতে নিয়ে নিজের সম্মুখে স্থাপিত ক'রে শম্ভুনাথ এমন ভাবে টেবিলের উপর আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসলেন, যাতে তাঁর মুখ এবং চক্ষুর খানিকটা অংশ ফ্রেমের ভিতর দিয়ে দেখা যায় অর্থাৎ তাঁকে যেন দূর থেকে ফ্রেমে বাধানো ছবি ব'লে ভুল করা চলে। তারপর ফুলের তোড়া, ফুলের মালা এবং রেশমী বস্ত্রাদি দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা এমন ভাবে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল যাতে শম্ভুনাথের দেহের অপ্রয়োজনীয় কোনো অংশই দৃষ্টিগোচর রইল না। অথচ ফ্রেমের ভিতরকার অংশকে ছবি ব'লে ভ্রম করবার কারণ প্রবলতর হ'য়ে উঠল। কেউ যাতে নিকটে গিয়ে ভাল ক'রে পরীক্ষা করবার সুযোগ না পায় সেই জন্য সম্মুখে ভূমিতলে পূজার তৈজস-পত্রাদি স্থাপন ক'রে বাধার সৃষ্টি করা হ'ল। উপরন্তু দূর হ'তেও যাতে ভাল ক'রে লক্ষ্য করা না যায়, সেজন্য নকল ছবির পিছন দিকে একটা অতিশয় উজ্জ্বল আলো প্রভা বিকীর্ণ ক'রে রইল। মোটের উপর সতর্ক দর্শকের তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে প্রতারিত করবার জন্য যে পরিমাণ কৌশল অবলম্বন করা হ'ল, তার মধ্যে গলদ বিশেষ কিছুই রইল না।

ইতিমধ্যে বাইরের ঘরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই উপস্থিত হয়েছেন। প্রসন্নকুমার যখন তাঁদের ভিতরে নিয়ে এসে পাতে বসালেন, তখন শম্ভুনাথের দিকটা ধূনার ধোঁয়ার অন্ধকার। আসন গ্রহণ করবার পূর্বে পাছে কেউ ভাল ক'রে ছবি দেখবার জন্য নিকটে দিয়ে দাঁড়ায়, সেই জন্য এই ফন্দি।

ভোজন আরম্ভ হওয়ার দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই ধোঁয়া পরিষ্কার হ'য়ে গেল। তখন প্রসন্নকুমার শম্ভুনাথের আলেখ্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলেন; বললেন, "মাত্র পাঁচ-সাত দিন হ'ল বেই মশায়ের এই ব্রোমাইট এনলার্জমেণ্টখানি কলকাতা থেকে এসেছে। এরই মধ্যে এমন শোচনীয় কারণে যে এখানি ব্যবহার করতে হবে, তা স্বপ্নেও কেউ মনে করে নি।"

ফোটো দেখে সকলেই অবাক। ছবি ত নয়, যেন সাক্ষাৎ মূর্তি!

রামবাবু বললেন, "চমৎকার করেছে ত! মনে হচ্ছে, ঠিক যেন আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন।"

বিপিনবাবু বললেন, "আর গায়ের রঙ দেখেছেন? ঠিক যেন মানুষের গা। কালার্ ব্রোমাইড নাকি রায় বাহাদুর?"

স্মিতমুখে মাথা নেড়ে প্রসন্নকুমার বললেন, কালার্ ব্রোমাইড। আপনার দেখছি এ সব জিনিস জানা আছে।"

পরম আপ্যায়িত হ'য়ে মৃদু হেসে বিপিনবাবু বললেন, "হে-হে! তা একটু-আধটু আছে বইকি। বছরে অন্তত চার-পাঁচ বার কলকাতায় যাই ত, এ সব আর্টের সঙ্গে একটু টচ আছে।"

প্রসন্নকুমার বললেন, "একটু নয়, বিলক্ষণ আছে।"

হরলালবাবু বললেন "ঐ জোর আলোটা পিছন দিকে না দিয়ে সামনের দিকে দিলে আরও স্পষ্ট দেখা যেত।"

প্রসন্নকুমার বললেন, "তাতে আমাদের পক্ষে হয়ত ভালই হ'ত, কিন্তু আধুনিক যুগের তরুণ রসিকদের পক্ষে নয়। আজকালকার দিনে রসের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টতা একটা মারাত্মক দোষ। সব হওয়া চাই একটু ঝাপসা ঝাপসা, একটু আউট অব ফোকাস্—নইলে সফ্‌ট্‌ এফেক্ট পাওয়া যাবে না, হ'য়ে যাবে হার্ড। এসব কথা বিপিনবাবু সবই জানেন। জিজ্ঞাসা করুন না ওঁকে।"

জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন হ'ল না, প্রশংসা প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতায় বিপিনবাবু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন; বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, আজকালকার আর্টিস্টরা ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডের গুরুত্ব খুব বুঝেছেন। তাই এসব ধরনের এফেক্ট সৃষ্টি করতে পারেন। ও আলো ঠিকই দেওয়া হয়েছে।"

তারিণীবাবু বললেন, "আচ্ছা, চুলগুলো আর দাড়িটা যেন একটু উঁচু উঁচু ঠেকছে, ফল্‌স্‌ চুল লাগানো হয়েছে নাকি?"

তারিণীবাবুর মন্তব্য শুনে মিস্টার কারফরমা উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন; বললেন, "এ কি আপনার হংস-দময়ন্তী যে, ফল্‌স্‌ চুল লাগাবে? জিনিসটা বড় আর্টিস্টের তৈরী তা বুঝতে পারছেন না?—একেবারে ট্রু টু লাইফ।"

নিজের নির্বুদ্ধিতাসূচক প্রশ্নের জন্য অপ্রতিভ হ'য়ে তারিণীবাবু বললেন, "না, তাই বলছি। সত্যিই জিনিসটা ভাল হয়েছে।"

আলোচনাটা ক্রমশ আহারের প্রতি নিবিষ্টতার মধ্যে মিলিয়ে গেল। কিন্তু ক্ষুধার চাহিদা যখন অনেকটা হ্রাস হ'য়ে এসেছে, তখন আবার কেউ কেউ শম্ভুনাথের ছবির প্রতি মনোযোগী হলেন।

ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময়ে বিপিনবাবু চমকে উঠলেন। মনে হ'ল, শম্ভুনাথের মুখের ভিতর থেকে জিভটা একটু-খানি বেরিয়ে এসেই আবার ঢুকে গেল। ভ্রান্তি না কি? মাথাটা একবার ঝেড়ে নিলেন, চোখ দুটো যথাসম্ভব পরিষ্কার করলেন, তারপর আড়ে আড়ে আর একবার তাকিয়ে দেখেই হাতের লুচির টুকরাখানা পাতের উপর সজোরে নিক্ষেপ ক'রে গম্ভীর হ'য়ে বসলেন। আবার জিভ ভিতরে ঢুকে গেল। এ কি কাণ্ড! মাথা খারাপ হ'ল না-কি! অথবা তার চেয়েও গুরুতর আর কিছু!

প্রসন্নকুমার বিপিনবাবুর অবস্থা লক্ষ্য করেছিলেন ; বললেন, "বিপিন-বাবু, এরই মধ্যে হাত গোটালেন কেন? খান।"

স্খলিতকণ্ঠে বিপিনবাবু বললেন, 'আজ্ঞে, খাচ্ছি, কিন্তু—"

"না, না, এরই মধ্যে 'কিন্তু' করলে চলবে না, এখন ত অনেক জিনিসই বাকি রয়েছে।"

প্রসন্নকুমারের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার কারফরমার দিকে গভীর খাদ স্বরের একটা গোঁ-গোঁ শব্দ শুনা গেল। দেখা গেল, পাতের দিকে মস্তক অবনত ক'রে মিস্টার কারফরমাই সেই শব্দ করছেন।

কি হ'ল, কি হ'ল, মিস্টার কারফরমা?" ব'লে প্রসন্নকুমার ছুটে আসতে

মিস্টার কারফরমা কিছুই বললেন না, তদবস্থ থেকেই শুধু কম্পিত হস্তের তর্জনীর দ্বারা শম্ভুনাথের দিকে দেখিয়ে দিলেন। সকলে সবিস্ময়ে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখা গেল, কপ্ ক'রে শম্ভুনাথের ছবির মুখ বন্ধ হ'য়ে গেল। সুতরাং কিছুক্ষণ থেকে সেই মুখ যে হাঁ ক'রে ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সমাগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট চাঞ্চল্য জাগ্রত হ'য়ে উঠল। বিপিনবাবু তখন আসনের উপর দাঁড়িয়ে উঠলেন।

যুক্তির এবং বিচারবুদ্ধির পরিচালনার দ্বারা ভয় হ'তে মুক্তি পাওয়ার চেয়ে বিমূঢ় হ'য়ে ভয় পেতে থাকা ঢের সহজ। সুতরাং ঘরসুদ্ধ লোক নির্বিবাদে একটা উৎকট আতঙ্কে আচ্ছন্ন হ'য়ে রইল।

দলের মধ্যে একজন স্পিরিচুয়ালিস্ট ছিলেন। তিনি সভীতিকণ্ঠে বললেন, "ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না। ছবির মধ্যে ভর হয়েছে।" তার পর কম্পিত পদে দাঁড়িয়ে উঠে শম্ভুনাথের দিকে মুখ ফিরিয়ে অতিদ্রুত গতিতে হস্ত চালনা করতে লাগলেন।

"শম্ভুনাথবাবু!"

আহ্বানের উত্তরে একটা অনুচ্চ কিন্তু গভীর গোঁ শব্দ শোনা গেল। সেটা শম্ভুনাথ না কারফরমা করলেন, তা ঠিক বোঝা গেল না।

ঘন ঘন হস্তচালনা করতে করতে স্পিরিচুয়ালিস্ট বললেন, "শম্ভুনাথ-বাবু, আমার দিকে তাকান।"

সকলে সভয়ে দেখলে তীব্র প্রজ্বলিত দৃষ্টিতে শম্ভুনাথ স্পিরিচুয়ালিস্টের দিকে কটমটিয়ে দৃষ্টিপাত ক'রে আছেন। চক্ষুর ভিতর যেন অগ্নিকাণ্ড চলেছে!

"আচ্ছা, হয়েছে এবার বিপিনবাবুর দিকে তাকান।"

বিপিনবাবু উত্তেজনার তাগিদে পুনরায় উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, অসঙ্গত প্রস্তাব শুনে টপ ক'রে ব'সে পড়লেন।

এবার কিন্তু স্পিরিচুয়ালিস্টের অনুরোধ রক্ষিত হ'ল না, তৎপরিবর্তে সমস্ত দালানটা বিদীর্ণ ক'রে একটা বিকট অট্টহাস্য উত্থিত হ'ল,—এ শম্ভুনাথেরই বহুপরিচিত হাস্য, কিন্তু পারলৌকিক সংযোগ হেতু অতিশয় কর্কশ।

তারপর যে কাণ্ডটা ঘটল তা বর্ণনার বস্তু নয়, কল্পনার ব্যাপার। স্পিরিচুয়ালিস্ট চোখ বুজে বোঁ ক'রে ঘুরে গিয়ে সবলে বিপিনবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন। কারফরমা ব'সে ব'সেই হস্তপদের সাহায্যে বাইরের ঘরের দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলেন। বাকি সকলে কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নেই! গেলাস গেল উল্টে, আসন গেল গুটিয়ে, পাতা গেল চটকে। সকলে একসঙ্গে বাইরের ঘরের দিকে ধাবিত হলেন। কারো কারো মনে সন্দেহের ছায়াপাত যে হয় নি তা নয়, কিন্তু সর্বাগ্রে পৈতৃক প্রাণটাকে নিরাপদ করার তাগিদ এত বেশি যে, মীমাংসার জন্য কেহ অপেক্ষা করলে না।

ব্যাপারটা যে এমন গুরু গতি নেবে, প্রসন্নকুমার তা পূর্বে ঠিক বুঝতে পারেন নি। "কিছু ভয় নেই, কিছু ভয় নেই। আপনারা বসুন, আপনারা বসুন।" ব'লে তিনি চীৎকার করতে লাগলেন, কিন্তু তখন কে কার আশ্বাসে কর্ণপাত করে! সকলে গুঁতোগুঁতি করতে করতে বাইরের ঘরে এসে উপস্থিত। তারপর হুড়কার কাছে ঠেলাঠেলি।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শম্ভুনাথ খিড়কির দ্বার দিয়ে বেরিয়ে

এসে একেবারে কম্পাউণ্ডের প্রান্তে ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

শঙ্কাকুল জনতা যখন কোনো প্রকারে বাইরের ঘরের দরজা খুলে কম্পাউণ্ডের উপর নেবে প'ড়ে গেটের উদ্দেশ্যে ধাবিত হ'ল, তখন গেটের নিকটে আবার একটা উচ্চহাস্য শুনা গেল। এবার কিন্তু বিকট নয়— কতকটা মোলায়েম। তথাপি ভয়চকিত বিপর্যস্ত জনসমূহ রাশ-টানা ঘোড়ার মত মুহূর্তের মধ্যে গতিরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তখন দূর থেকে হাত তুলে উচ্চকণ্ঠে শম্ভুনাথ বললেন, "মশায়রা অনুগ্রহ ক'রে শুনুন। আমি ভূত নই, ভবিষ্যৎ নই,—আমি আপনাদেরই মতো বর্তমান। অর্থাৎ রক্তমাংসের শরীর নিয়ে আপনাদেরই মতো বেঁচে আছি। যে চমৎকার প্রহসনের শেষ অংশটা আপনারা করলেন, তার প্রথম অংশটা শুনলে খুশি হ'য়ে বাড়ি যাবেন। আপাতত সকলে বাইরের ঘরে বসবেন চলুন।"

সকলকে আশ্বস্ত করতে পাঁচ মিনিট গেল। তারপর প্রসন্নকুমারের বর্ণিত কাহিনী শুনে একটা প্রচণ্ড হাসির রোল উঠল।

ততক্ষণে আবার নূতন ক'রে পাতা হয়েছে। শম্ভুনাথ করজোড়ে সকলকে বললেন, "শ্রাদ্ধের ভোজটা ত ভাল ক'রে খাওয়া হয় নি, এবার পুনর্জন্মের ভোজটা অনুগ্রহ ক'রে খাবেন চলুন।"

আনন্দের আতিশয্যে একজনও আপত্তি করলেন না। এবার অবশ্য ব্রাহ্মণভোজনের পঙক্তির মধ্যে প্রসন্নকুমার ও শম্ভুনাথ দুই বৈবাহিকের দুখানা পাত বেশি পড়ল।

দামোদরের

বৈতরণী পার

শ্রাবণ মাস। কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েছে। প্রথম ঘণ্টায় আমার ক্লাস ছিল না। বেলা সাড়ে এগারোটার সময়ে কলেজে উপস্থিত হ'য়ে দেখি, সহসা এক অচিন্তিত কাণ্ড ঘটেছে। ইতিহাসের অধ্যাপক গৌরমোহনবাবু যথারীতি অধ্যাপকদের বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ ক'রে চেয়ারে উপবেশনের পর দু-চার বার আড়ামোড়া ভেঙে টেবিলের উপর দুই বাহুর মধ্যে সেই-যে মাথা গোঁজেন, বহু ডাকাডাকি আর ঠেলাঠেলিতেও সে মাথা কিছুতেই উঁচু হয় নি। ব্যস্ত হ'য়ে প্রিন্সিপাল তখন দুজন ডাক্তারকে ফোন করেন। ডাক্তাররা এসে গৌরমোহনবাবুকে পরীক্ষা ক'রে যে কথা বলেন তাতে অবশ্য মাথা উঁচু হবার কথা নয়, কারণ উক্ত কার্য করবার জন্য যে প্রাণশক্তির প্রয়োজন গৌরমোহনের দেহের মধ্যে তার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। গৌরমোহনবাবুর মৃত্যু ঘটেছে।

ইত্যবসরে মৃত অধ্যাপকের আত্মীয়-স্বজনেরা এসে পড়েছেন, শ্মশান-যাত্রার ব্যবস্থাদি চলেছে, এবং প্রিন্সিপাল একটি জরুরী শোকসভা আহূত ক'রে মৃত অধ্যাপকের প্রতি সম্মানার্থে সেদিন ত কলেজ বন্ধ করেছেনই, পরদিনও ছুটি দিয়েছেন। শবদেহকে শ্মশান পর্যন্ত অনুসরণ করবার জন্য ছাত্রদিগকে অনুরোধও করেছেন।

সেদিন শুক্রবার, পরদিন ছুটি এবং তৎপরদিন রবিবার। সুতরাং মোটের উপর আড়াই দিন ছুটি দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া, শুক্রবার থেকেই রেলে উইক্-এণ্ড টিকিট পাওয়া যায়। এত বুঝে-সুঝে সব দিক বিবেচনা ক'রে গত হওয়ার জন্য মনে মনে বিগতপ্রাণ অধ্যাপককে ধন্যবাদ দিয়ে এবং শ্মশানের পথে শবদেহকে অনুসরণ করতে না পারার জন্য দেহবিমুক্ত আত্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে মেসের দিকে দ্রুতপদে ধাবিত হলাম। মেসে পৌছে বইগুলো সশব্দে তক্তাপোশের উপর ফেলে একখানা ধুতি, একটা জামা, টচ আর মনিব্যাগটা নিয়ে একেবারে সোজা শিয়ালদহ স্টেশনে এসে টিকিট কিনে আসাম মেলের একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে বসলাম। পথে খানিকটা অগ্রসর হ'য়ে একটা স্টেশনে আসাম মেল পরিত্যাগ ক'রে প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধ'রে আমাদের গ্রামে যাবার স্টেশনে উপনীত হব। সেখান হ'তে মাইল তিনেক দূরে একটা নদী, এবং নদী উত্তীর্ণ হ'লেই গ্রাম।

অকস্মাৎ অজানিত গৃহাগমনের দ্বারা আত্মীয়-পরিজনকে চমৎকৃত ক'রে দেবার একটা আনন্দ ত ছিলই, তাছাড়া বিশেষ ক'রে এমন একটা অন্য ব্যাপার ছিল যার মধ্যে শুধু আনন্দই নয়, প্রচুর উত্তেজনার কারণও বর্তমান ছিল। দিন দুই হ'ল বাড়ি থেকে যে চিঠি এসেছে তা থেকে জানতে পেরেছি, বিমলা আমাদেরই গ্রামে তার মাসীর বাড়ি বেড়াতে এসেছে, এবং সম্ভবত মাস খানেক সেখানে থাকবে। কয়েক মাস পূর্বে এক সুতহিবুক যোগের লগ্নে বিমলা আমার জীবন-সঙ্গিনী হয়েছে। আমি বাড়ি গেলে অবিলম্বেই যে বিমলাকে গৃহে আনা হবে আত্মীয়বর্গের এরূপ সুবিবেচনার প্রতি আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল।

গ্রামে যাবার ক্ষুদ্র স্টেশনটিতে যখন গাড়ি থেকে অবতরণ করলাম, তখন ঠিক সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। বৃষ্টি পড়ছে না, কিন্তু সমস্ত আকাশ ধূসর মেঘে আচ্ছন্ন। সামান্য স্টেশন, তার উপর ঝড়-বৃষ্টির দিন, মাত্র পাঁচ-ছয় জন আরোহী গাড়ি থেকে নামল, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও আমাদের গ্রামের দিকে যাবে না। স্টেশনে গাড়ি একখানিও নেই, থাকলেও মাইল দুয়েকের বেশি সে পথে গাড়ি যায় না। শেষ মাইল খানেক পথ তরু-গুল্ম-আকীর্ণ প্রান্তর ভেদ ক'রে পায়ে হেঁটেই শেষ করতে হয়।

স্টেশন-মাস্টারের সহিত আমার পরিচয় ছিল। আমাকে দেখে সে বললে, "বিনয়বাবু যে হঠাৎ এ সময়ে? বাড়ি যাচ্ছেন না-কি?"

প্রসঙ্গটা সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে বললাম, "যাচ্ছি।"

"সঙ্গী-টঙ্গি আলো-টালো আছে ত?"

"সঙ্গী ত দেখছি নে, টর্চ আছে।"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে স্টেশন-মাস্টার বললে, "এই ঝড়-বাদলার দিনে রাত সামনে ক'রে এতখানি পথ একলা যাওয়া ত আমার ভাল ঠেকছে না। তার চেয়ে কাল সকালে যাবেন, আজ রাতটা আমার এখানে কাটান না? সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনে প'ড়ে প'ড়ে গল্প-গুজব করা যাবে। মেয়েরা ত এখন বাপের বাড়িতে।"

অল্প দিন হ'ল মেয়েদের অর্থাৎ স্ত্রীকে (গৌরবে বহুবচন) পিত্রালয়ে পাঠিয়ে স্টেশন-মাস্টার বিরহ-বেদনায় দিন যাপন করছে, সুতরাং তার সঙ্গলিপ্সু মন আমাকে পেয়ে লোভাতুর হ'য়ে উঠেছে।

প্রস্তাবটা প্রথম মুখে নিতান্ত মন্দ ঠেকল না, কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন মনে হ'ল যে এতখানি পথ এত উৎসাহের সহিত এসে মাত্র তিন মাইলের জন্য স্টেশন-মাস্টারের সহিত অসার কথোপকথনে রাত্রি যাপন করতে হবে এবং এই তিন মাইল পথ কোন প্রকারে অতিক্রম করতে পারলে আজ রাত্রেই বিমলার সঙ্গলাভ হয়ত দুর্লভ না-ও হতে পারে, তখন সজোরে মাথা নেড়ে বললাম, "নাঃ, চ'লেই যাই। ভয় করলেই ভয়,—বুঝছেন কি না? হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেলে তিন মাইল পথ আর কতক্ষণ?"

হন্ হন্ ক'রে দু মাইল পথ অবশ্য এক রকমে কেটে গেল, কিন্তু সদর-রাস্তা ছেড়ে মাঠে প'ড়েই হ'ল বিপদ। রাত্রি বৃদ্ধির সহিত অন্ধকার বৃদ্ধি-হেতু পথচিহ্ন সব সময়ে স্পষ্ট দেখা যায় না; জল-কাদার উপর প'ড়ে টর্চের আলো অনেকখানিই ম'জে যায়, ভাল খোলতাই হয় না; পায়ের তলায় মৃত্তিকা বৎপরোনাস্তি পিচ্ছিল ব'লে ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে চলতে হয়; দুই দিকে পথের ধারে সর্ সর্ ক'রে কি সব স'রে যায়! মনে মনে আবৃত্তি করি—ওঁ আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা জরৎকারু মুনেঃ পত্নী মনসা দেবি নমোঽস্তুতে। নিকটেই একদল শিয়াল অকস্মাৎ সজোরে ডেকে ওঠে; দূরে বন-বাদাড় বিদীর্ণ ক'রে একটা গোলাকার জন্তু অতি দ্রুতবেগে ছুটে চ'লে যায়,—বর্ষাকাল, চারিদিক জলে ভেসে গেছে, এ সময়ে বন্য বরাহের আমদানি আশ্চর্য নয়।

কিন্তু এ-সকল ত গেল বাস্তব জগতের সমূলক আশঙ্কার কথা;—এ সকল হ'তে উদ্ধারের সম্ভাবনা এবং উপায় নিশ্চয় থাকতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে যদি অবাস্তব জগতের অমূলক আশঙ্কা যোগ দেয় তা হ'লেই সর্বনাশ! উদ্যোগ, আয়োজন, সমারোহ ক'রে শবদেহ নিয়ে যেতে কিছু বিলম্ব হ'য়েই থাকবে—এতক্ষণ হয়ত নিমতলার ঘাটে গৌর-মোহনবাবুর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হ'য়ে এল। হঠাৎ যদি খেয়ালবশে তাঁর অশরীরী আত্মা চিতাক্ষেত্র পরিত্যাগ ক'রে একটা বায়বীয় দেহ

ধারণ ক'রে আমার পাশে উপস্থিত হ'য়ে ধীরে ধীরে বলে, 'বাবা বিনয়, তুমি ইতিহাসে একটু কাঁচা আছ, ভাল ক'রে পাস করতে যদি চাও তাহ'লে ঐ বিষয়টিতে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়ো', তা হ'লেই ত গোলযোগ!

শুধু গ্রামেই নয়, কলিকাতাতেও সাহসী ব'লে আমার বিশেষ একটু খ্যাতি আছে। কিন্তু সে খ্যাতি আর বুঝি রক্ষা পায় না, পথের কাদার উপরই সশব্দে ভেঙে পড়ে! দক্ষিণে ও বামে অপাঙ্গে দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য দীর্ঘতর ক'রে দিলাম। 'আস্তিকস্য মুনের্মাতা'র প্রতি আবেদন-নিবেদন আপনা-আপনি বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, মনের মধ্যে সন্ত্রস্ত চিত্তে অজ্ঞাতসারে কখন জপ আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে—ওঁ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে, রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ। যা হোক, দুঃখ-বিপত্তিরও শেষ আছে। শেষ পর্যন্ত কোনো রকমে নদীর তীরে উপনীত হলাম।

উপনীত ত হলাম, কিন্তু নদী উত্তীর্ণ হই কি ক'রে? রজনীর অস্পষ্ট আলোকে যতদূর দেখা যায় খেয়াঘাটে জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গেল না। মাঝির ক্ষুদ্র কুটিরটা অন্ধকারাবৃত। খেয়া নৌকাখানা ঘাটে বাঁধা রয়েছে বটে, কিন্তু তার উপর একজনও আরোহী নেই। হু-হু ক'রে একটা হাল্কা জলো হাওয়া বইছে, তার মধ্যে চাপা কান্নার মতো এমন একটা অনির্ণেয় হুঙ্কার, যা প্রাণের মধ্যে অস্বস্তিজনক বিহ্বলতার সঞ্চার করে।

উচ্চকণ্ঠে ডাকলাম, "দামোদর! দামোদর মাঝি আছ?"

কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না, গোটা দুই কুকুর আর্তস্বরে ডাক দিয়ে উঠল।

কি বিপদ! সমস্ত রাত্রি এই জনহীন খেয়াঘাটে একাকী কাটাতে হবে নাকি? তিন মাইল পথ প্রত্যাবর্তন ক'রে স্টেশনে ফিরে যাওয়াও ত অসম্ভব। স্টেশন-মাস্টার কর্তৃক নিবেদিত ধ্রুব আশ্রয়টি পরিত্যাগ ক'রে আসার জন্য মনের মধ্যে সুগভীর পরিতাপ উপস্থিত হ'ল।

পুনরায় প্রাণপণ জোরে ডাক দিলাম, "মাঝি! দামোদর মাঝি! দামোদর মাঝি আছ?"

বহুদূরে ক্ষীণ অস্পষ্ট কি একটা শব্দ যেন শোনা গেল; মনুষ্যকণ্ঠ-স্বরও হ'তে পারে, চলমান বায়ুর মর্মরধ্বনি হওয়াও আশ্চর্য নয়। তারপর সহসা কি যেন একটা অনুভূতি বোধ ক'রে পিছন ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। আমার পশ্চাতে দীর্ঘাকৃতি এক মনুষ্যমূর্তি দাঁড়িয়ে। আর্তকণ্ঠ হ'তে নির্গত হ'ল, "কে? কে তুমি?"

"আজ্ঞে, বিনুবাবু, আমি দামোদর। চলুন, আপনাকে পার ক'রে দিয়ে আসি।"

দামোদর! বাঁচা গেল। আশ্বস্ত হ'য়ে বললাম, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে দামোদর? ডেকে ডেকে হয়রান যে!"

দামোদর বললে, "বিপদের কথা আর বলেন কেন বিনুবাবু! ওই হোথা পাকুড়গাছতলায় ব'সে ছিনু। আমার কি আর আসবার কথা! তবে নাকি আপনি ছেলেমানুষ, রেতের বেলা ভয় পেয়ে ডাকাডাকি লাগিয়ে দিলেন—মায়া হ'ল, তাই চ'লে এনু। হাজার বার ত পার করেছি, আর একবার না হয় পার ক'রেই দিই। নিন, চলুন, ঝপ ক'রে রেখে আসি আপনাকে। আমাকে আবার অনেক দূর যেতে হবে।"

খেয়া নৌকার দিকে অগ্রসর হ'য়ে বললাম, "এই ঝড়-বাদলার রাতে অনেক দূরে আবার কোথায় যাবে দামোদর?"

দামোদর বললে, "ও-কথা ছাড়ন দেন বিনুবাবু। ডাক পড়লে কি আর রক্ষে আছে? যেতেই হবে।"

কথাটির সঠিক অর্থ উপলব্ধি করতে পারলাম না। নৌকায় উঠে বসলাম, তারপর দড়ি খুলে নৌকা ঠেলে দিয়ে দামোদরও লাফিয়ে উঠে পড়ল। ঠিক আর-পার না হ'লেও গ্রাম বেশি দূরেও নয়, পার হ'তে মাত্র দশ-বারো মিনিট সময় লাগে। খানিকটা পথ নিঃশব্দে দাঁড় বেয়ে এসে সহসা এক সময়ে দামোদর বললে, "বৈতরণীর কোনো খোঁজ রাখেন বিনুবাবু?"

বললাম, "কোন্ বৈতরণী ?"

"ঐ যে গো, যে বৈতরণী পার হ'য়ে যমের বাড়ি যেতে হয়।"

দামোদরের কথা শুনে হেসে ফেললাম; বললাম, "যমের বাড়ি যাবার এখনো একটু দেরি থাকতে পারে মনে ক'রে বৈতরণীর খোঁজ এ পর্যন্ত করি নি।"

শিউরে উঠে দামোদর বললে, "আহা, ষাট্ ষাট্! সে কথা বলছি নে। তোমরা পণ্ডিত মানুষ, শাস্তোর-টাস্তোর পড়েছ, তাই জিজ্ঞেস করছি।" তারপর এক মুহূর্ত নীরব থেকে কতকটা নিজের মনেই বলতে লাগল, "শুনেছি টগ-বগ ক'রে ফুটছে, রক্তবর্ণো রঙ, পচা মাংস আর হাড় গিজ-গিজ করছে। কিন্তু সে যাই হোক, ঠিক পার হ'য়ে যাব। জল-ঝড়-তুফান-বৃষ্টির মধ্যে লাখো লোককে পার করলাম, আর নিজে একটা বৈতরণী নদী পার হ'তে পারব না! তা যদি না পারি ত দামোদর মাঝির মিত্যুই ভাল।" ব'লে খল্ খল্ ক'রে হেসে উঠে বললে, "এই দেখো মানুষের ভুলের তামাসা! ম'রে গিয়েও আবার বলছি মিত্যুই ভাল!"

অবাক হ'য়ে দামোদরের কথা শুনছিলাম, শেষাংশ শুনে বিস্ময়ের

পরিসীমা রইল না ; বললাম, "কি যা-তা বকছ দামোদর ? ম'রে গিয়ে আবার মিত্যু—ও সব কি বলছ ?"

একটুখানি হেসে দামোদর বললে, "ঠিকই বলছি বিনুবাবু, যা-তা বলছি নে। আজ সাঁঝের বেলা আমার মিত্যু ঘটেছে। এই যে দেহো দেখচো, এ ছায়া-দেহো, এতে পদাত্থো নেই। একটা ঢিল ছুঁড়ে মারো, সাঁ ক'রে দেহো ভেদ ক'রে বেরিয়ে যাবে। তবে যদি বল, দাঁড় বাইচি কি ক'রে ? তা ছায়া-দেহোতে শক্তি বিস্তর। এথ দেখ না, কেমন সাঁ সাঁ ক'রে বেয়ে চলেছি কিন্তু এক বিন্দু ঘাম নেই।" তারপর দামোদর পুনরায় উচ্চস্বরে হেসে উঠল ; বললে, "কি গেরো রে বাবা ! ভুলের কাণ্ড দেখ ! দেহোতে এক রতি মাংসই যখন নেই, তখন ঘাম বেরোবে কোথা থেকে ?"

দামোদরের হয়ত ঘাম বেরোয় নি, কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেল। মানলামই না-হয় সে প্রেত নয় ; কিন্তু মাঝ-নদীতে টেনে নিয়ে এসে এ-রকম অদ্ভুত কথাবার্তা—এ ত সহজ লোকেরও নয়। চিরদিন সে স্বল্পভাষী ভালমানুষ—আজ তার এ কি হ'ল ? প্রেত যদি নাই হ'য়ে থাকে, তাহ'লে হয় পাগল হয়েছে, নয় মাতাল ; অর্থাৎ হয় উন্মাদ, নয় উন্মত্ত। জলের উপর এ রকম লোকের হাতে আত্মসমর্পণ ক'রে ব'সে থাকা ত একেবারেই নিরাপদ নয়। এখন ভালয় ভালয় ডাঙায় পা ফেলতে পারলে বাঁচি।

আমায় মৌন দেখে দামোদরের মনে হ'ল, আমি তার কথায় হয়ত সন্দেহপর হয়েছি। বললে, "আপনি যদি পিত্যয় না যান বিনুবাবু, চলুন তা হ'লে নৌকো ফিরিয়ে নিয়ে যাই, দেখবেন পাকুড়গাছতলায়

আমার দেহোটা নীল্‌চে মেরে প'ড়ে আছে। উঃ, কি সব্বোনেশে সাপই রে বাবা! একেবারে জাত শঙ্খচূড়! ফোঁ ক'রে মারলে ছোবল, আর সমস্ত দেহোর মধ্যে যেন সাত শো বিদ্যুতের শিখে খেলে গেল! তারপর সে কি জ্বলুনি বিনুবাবু, সমস্ত শরীরে যেন জলবিছুটি ঘ'ষে দিয়েছে। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়, মিনিট পাঁচেক পরেই ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে দামোদরের দেহোর শিয়রে বসলাম। কেদার আর বিশে গেছে সাপের রোঝা গণশাকে ডাকতে। গণশা ত গণশা, গণশার বাপ স্বয়ং শিব এলেও এখন আর কিছু হচ্ছে না। তা ছাড়া দেহো-কারাগার থেকে একবার যখন বেরোতে পেরেছি আর কি সেঁদোতে আছে? কি বলুন বিনুবাবু?"

কি যে বলব তা ত জানি নে,—মানুষের সঙ্গে, না, প্রেতের সঙ্গে কথা কচ্ছি তাই যখন ঠিক জানি নে। তথাপি যথাসাধ্য সাহস সঞ্চয় ক'রে স্খলিত কণ্ঠে বললাম, "তুমি যে কথা বললে তা লাখ কথার এক কথা, ওর ওপর আর কথা নেই।" প্রেতই হোক আর প্রমত্তই হোক প্রসন্ন হবে মনে ক'রে এ কথা বললাম।

ঘাট সমীপবর্তী হয়েছিল, নৌকা তটে লাগতেই ডাঙার উপর লাফিয়ে পড়লাম। মৃত্তিকার স্পর্শ পেয়ে সে যে কি আশ্বাস, কি আনন্দ, তা অনুমান করাই ভাল। ইচ্ছা হ'ল গৃহের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিই, কিন্তু পারানির পয়সা? দামোদরের দিকে ফিরে বললাম, "দামোদর, তোমার পারানির পয়সা নাও।"

দামোদর বললে, "ও থাক্ বিনুবাবু, পরে যা হয় হবে, আপনি এখন বাড়ি যান।"

গৃহে পৌঁছানোর পর সহসা আমাকে দেখে একটা হর্ষধ্বনি উঠল বটে, কিন্তু আমি যখন আমার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলতে আরম্ভ করলাম তখন অপরিসীম বিস্ময়ে এবং কৌতূহলের মধ্যে সে হর্ষধ্বনি নিমেষের মধ্যে লুপ্ত হ'ল। গল্প শেষ হ'লে কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলে, কেউ করলে অবিশ্বাস, কেউ বললে—পরিশ্রান্ত হ'য়ে নৌকার উপর ঘুমিয়ে প'ড়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম, কেউ বা বললে—গৌরমোহনবাবুর মৃত্যুজনিত মনের মধ্যে বিভ্রম উপস্থিত হয়েছিল। আমি বললাম, "দেখ, দামোদর যদি পাগল অথবা মাতাল না হ'য়ে থাকে তা হ'লে ব্যাপারটা যে নিতান্ত সহজ নয়, এ কথা আমি নিশ্চয় ক'রে বললাম। স্বপ্ন আর বিভ্রম—ও-সব বাজে কথা সিকেয় তুলে রাখ।"

শ্রোতৃবর্গের মধ্যে প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব দু-চার জন ছিলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'য়ে সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের জন্য অবিলম্বে একটা দল গঠিত হ'য়ে উঠল। অবশ্য আমিও তাতে যোগ দিলাম।

ঘাটে উপনীত হ'য়ে দেখা গেল, দামোদরের নৌকা ঘাটে বাঁধা রয়েছে, কিন্তু দামোদর কোথাও নেই। দলের মধ্যে দুজন নৌকা চালনায় পটু ছিল, তারা কালবিলম্ব না ক'রে নৌকার দড়ি খুলে ছেড়ে দিলে। আমরা লাফালাফি ক'রে নৌকায় উঠে পড়লাম। নদী উত্তীর্ণ হ'য়ে পরপারে গিয়ে দেখা গেল, অদূরে পাকুড়গাছের তলায়

গোটা তিন-চার হ্যারিকেন লণ্ঠন এবং সেই আলোর মধ্যে ইতস্তত-সঞ্চরমাণ কয়েকটা মনুষ্যমূর্তি। দ্রুতপদে সেখানে উপস্থিত হ'য়ে আমরা দেখলাম, দামোদরের দীর্ঘদেহ ভূমির উপর শয়ান, সাপের রোঝা এসে যথাসাধ্য চেষ্টার পর নিষ্ফল হ'য়ে অল্পক্ষণ হ'ল প্রস্থান করেছে, অগত্যা দামোদরের শবদেহের সৎকারের জন্য উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ হয়েছে। শুনলাম, ঠিক সন্ধ্যার পূর্বে সর্পাঘাতে দামোদরের মৃত্যু ঘটেছে।

অল্পক্ষণ তথায় অবস্থানের পর গ্রামে যখন আমরা ফিরে এলাম, তখন রাত্রি সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই দামোদরের ভূত হওয়ার কাহিনী রাষ্ট্র হ'য়ে সমস্ত গ্রামবাসীর মনে একটা গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল, তার উপর তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে আমরা যখন প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন সে আতঙ্ক দারুণ দুশ্চিন্তায় পরিণত হ'ল। কখন যে কোন্ বাড়িতে সহসা উপস্থিত হ'য়ে দামোদর বৈতরণী পার হওয়ার প্রসঙ্গ আরম্ভ ক'রে দেবে, সে কথা মনে ক'রে সকলে একেবারে সিঁটিয়ে রইল।

রাত্রি বারোটার সময়ে আমার এক সহৃদয়া বউদিদি বিমলাকে আমার ঘরে দিয়ে গেলেন। যাবার সময়ে আমার কানে কানে ব'লে গেলেন, "ভূতের ভয়ে কিছুতেই বাড়ি থেকে রাত্রে আসতে চায় না। অনেক চেষ্টা ক'রে আনতে হয়েছে। ছেলেমানুষ, তুমি যেন দামোদরের গল্প-টল্প ব'লে ভয় দেখিয়ো না।" এ কথার উত্তরে আমি কিছু বললাম না, শুধু নিঃশব্দে একটু হাস্য করলাম।

হুড়কো লাগিয়ে ফিরে দেখি, আঁচল থেকে কি খুলে বিমলা আমার খাটের চারিদিকে ছড়িয়ে দিলে, তারপর তাড়াতাড়ি একটা কি কাগজ

আমার বালিশের তলায় গুঁজে রাখলে। কি ছড়ালে জানতে প্রবল কৌতূহল হওয়ায় ভূমি থেকে দু-চারটে তুলে দেখি, শ্বেতসরষে। কাগজটা বার ক'রে দেখি, তাতে লেখা রয়েছে—

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতা।
যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥
ওঁ বেতালশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্বে নারসিংহেন তাড়িতাঃ॥

সর্বনাশ! এ যে একেবারে পুরাদস্তুর ভূতাপসারণের ব্যবস্থা! বিমলার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললাম, "এ সব ব্যবস্থা কার জন্যে বিমলা? শুধু দামোদরের কথা মনে ক'রে, না, আমার বিষয়েও সন্দেহ ক'রে?"

সভীতিকাতর কণ্ঠে বিমলা বললে, "ও-সব কথা বলতে নেই।"

আচ্ছা, বলব না না-হয়; কিন্তু কার বলতে নেই—আমার, না, বিমলার—তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

উট-রোগ

প্রায় হাজার বৎসর আগেকার কথা। তখন প্রতিহার-বংশের পতনের ফলে বিস্তৃত সাম্রাজ্য কয়েকটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হ'য়ে গেছে। সেই খণ্ডরাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজা সূর্যপাল খুব পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠে সাম্রাজ্য গঠন এবং প্রতিহার-বংশের পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনবার দিকে মন দিয়েছেন, এমন সময়ে সূর্যপালের শরীরে কঠিন ব্যাধি দেখা দিলে।

ব্যাধি যে ঠিক কি, তা কিছুতেই নির্ণয় করা যায় না। দক্ষিণ পায়ের একটা শিরা টন্‌টন্ ঝন্‌ঝন্ করে, বুক ধড়ফড় করে, আর বাম চক্ষুটা থেকে থেকে জবাফুলের মতো লাল হয়ে ওঠে। রাজবৈদ্যগণের মধ্যে কেউ বললেন—বাতব্যাধি, কেউ বললেন—হৃদ্‌রোগ, কেউ বা বললেন—মস্তিষ্কের পীড়া। উপসর্গ তেমন কিছু সাংঘাতিক নয়, কিন্তু মহারাজা দিন দিন বলহীন এবং কৃশ হ'য়ে পড়তে লাগলেন। মুখ বিস্বাদ, মেজাজ খিটখিটে, আহারে রুচি নেই, আমোদ-প্রমোদে মন সাড়া দেয় না।

রাজবৈদ্যগণ একটা পরামর্শ-সভা ক'রে স্থির করলেন যে, এ ব্যাধি আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদিত কোন ব্যাধি নয়; এ নিশ্চয় এমন একটা চোরা ব্যাধি যার উৎপত্তি-স্থল শরীরের বিশেষ কোন গুপ্ত প্রদেশে নিহিত। নিদানশাস্ত্র মথিত ক'রে যখন তার কোন হদিস পাওয়া গেল না, তখন

তাঁরা রোগের উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হ'ল না। মূলে কুঠারাঘাত না ক'রে শুধু শাখাচ্ছেদন করলে কি মহীরুহের বিনাশ সাধন করা যায়? রোগ বেড়েই চলল, মহারাজা সূর্যপাল ক্রমশ নির্জীব হ'য়ে পড়তে লাগলেন।

স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তায় মহারাণী চন্দ্রশীলা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করেছিলেন। মহারাজার আরোগ্য কামনায় তিনি কত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, কত যাগ-যজ্ঞ, কত গ্রহপূজা করালেন; মাদুলি এবং কবচে, নীলায় এবং পলায় মহারাজার কণ্ঠ ও বাহু ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল; তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক—কিছুই বাদ গেল না; কিন্তু রোগ বিন্দুমাত্র উপশমের দিকে না গিয়ে উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। মনে হ'ল, দেবতাও বুঝি সূর্য্যপালের প্রতি বিরূপ।

রাজবৈদ্যগণের সকল চেষ্টা যখন বিফল হ'ল, তখন রাজ্যের অপরাপর খ্যাতনামা চিকিৎসকগণকে আহ্বান করা হ'ল। কিন্তু কেউই রাজাকে বিন্দুমাত্র সুস্থ করতে সমর্থ হলেন না; শুধু অর্থব্যয় এবং কালক্ষেপই সার হ'ল। সকলেই রাজার জীবনের বিষয়ে হতাশ হলেন; রাজা নিজেও বুঝলেন, তাঁর প্রাণপ্রদীপ নির্বাপিত হ'তে আর বেশি বিলম্ব নেই।

দুর্বল শরীরে সূর্যপাল চিকিৎসার তাড়নায় অস্থির হয়েছিলেন। অরিষ্ট, রসায়ন, তৈল, পাঁচন, বটিকা আর চূর্ণের উৎপীড়ন মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়ে কষ্টকর হ'য়ে উঠেছিল। রাজা মনে মনে একটা সঙ্কল্প ক'রে তাঁর প্রধান মন্ত্রী বল্লভাচার্যকে ডেকে পাঠালেন।

বল্লভাচার্য উপস্থিত হ'লে রাজা বললেন, "মন্ত্রীমশায়, আজ থেকে আমি সকল চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দিলাম। বৈদ্যরা একেবারে অকর্মণ্য

বাজে লোক, বিদ্যে বুদ্ধি কারও কিছু নেই। সহজ রোগ হ'লে তারা হয়ত সময়ে সময়ে সারাতে পারে, কিন্তু কঠিন রোগের তারা কেউ নয়। শুধু আমার রাজ্যে নয়, আপনি রাজ্যে রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দিন, যে-বৈদ্য আমাকে রোগমুক্ত করতে পারবে তাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেব, কিন্তু চিকিৎসারম্ভের তিন মাসের মধ্যে রোগ সারাতে না পারলে তার প্রাণদণ্ড হবে। এ শর্তে যদি কেউ আসে, তা হ'লে বুঝতে হবে সে একজন যথার্থ শক্তিশালী চিকিৎসক। ঘোষণাপত্রে সবিস্তারে আমার রোগ-লক্ষণ বর্ণনা করবেন, যাতে যারা আসবে প্রস্তুত হ'য়েই যেন আসতে পারে।"

রাজার কথা শুনে বল্লভাচার্য অতিশয় চিন্তিত হ'য়ে বললেন, "মহারাজ, এ কিন্তু বস্তুত চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দেওয়াই হ'ল। কারণ অতিবড় ক্ষমতাশালী চিকিৎসকও প্রাণদণ্ডের ভয়ে আপনার চিকিৎসা করতে সাহস করবে না।"

রাজা তখন মরিয়া হয়েছেন ; বললেন, "তা না করুক। এ রোগে আমার মৃত্যু অনিবার্য তা ত বুঝতেই পারছি,—দলন মলন আর অরিষ্ট-রসায়নের হাত থেকে মুক্তি লাভ ক'রে কয়েক দিন একটু শান্তি ভোগ ক'রে মরতে চাই।"

এ সঙ্কল্প থেকে রাজাকে নিরস্ত করবার জন্যে বল্লভাচার্য, মহারাণী চন্দ্রশীলা, অমাত্যবর্গ, এমন কি রাজগুরু পর্যন্ত অনেক অনুরোধ-উপরোধ সাধ্য-সাধনা করলেন ; কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। রাজা একেবারে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

অগত্যা বল্লভাচার্য চতুর্দিকে ঘোষণাপত্র জারি করলেন। উত্তরে

গান্ধার, কাশ্মীর ; পশ্চিমে সিন্ধুদেশ ; দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, মহাকোশল, চালুক্য রাজ্য ; পূর্বে অঙ্গ, বঙ্গ, চম্পা রাজ্য—কোন দেশই বাদ পড়ল না। কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা যথেষ্ট লোভনীয় পুরস্কার বটে, কিন্তু জীবনও ত তার চেয়ে কম লোভনীয় বস্তু নয়! বড় বড় চিকিৎসক পরাভূত হয়েছেন শুনে কোন চিকিৎসকই সূর্যপালের চিকিৎসা করতে অগ্রসর হন না। এইরূপে বিনাচিকিৎসায় প্রায় ছয় মাস কাল অতিবাহিত হ'ল। রাজার জীবনীশক্তি আরও ক্ষীণ হ'য়ে এল।

সেই সময়ে মহারাজা সূর্যপালের রাজধানী সিংহগড় থেকে পঁচিশ ক্রোশ দূরে চৈতসা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে অতিশয় দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ-দম্পতি বাস করত। অভাবের নিদারুণ তাড়নায় তাদের জীবন দুর্বহ হ'য়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণের বিদ্যার দৌড় খুব বেশি ছিল না, কিন্তু কূটবুদ্ধিতে তার সমকক্ষ ব্যক্তি পাওয়া সত্যই কঠিন ছিল। সূর্যপালের চিকিৎসার পুরস্কার ঘোষণার সংবাদ সেই ব্রাহ্মণ-দম্পতিরও শ্রুতিগোচর হ'ল।

ব্রাহ্মণের নাম দেবরাজ উপাধ্যায়। কয়েক দিন নিরবসর চিন্তার পর হঠাৎ একদিন দেবরাজ তার স্ত্রীকে বললে, "ব্রাহ্মণী, তুমি কিছুদিন ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা কোনও রকমে সংসার চালাও, আমি সিংহগড়ে চললাম মহারাজা সূর্যপালের ঘোষিত এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করতে।"

দেবরাজের কথা শুনে তার স্ত্রী বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "ও মা, সে কি কথা গো! কত বড় বড় বৈদ্য কবিরাজ হার মেনে গেল মহারাজের রোগ সারাতে, আর তুমি চিকিৎসাশাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গ জান না, তুমি চললে মহারাজকে সারিয়ে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করতে?"

দেবরাজ বললে, "বড় বড় বৈদ্য কবিরাজ যখন হার মেনে গেছে, তখন বুঝতেই পারছ—এ রোগ শাস্ত্রীয় চিকিৎসায় সারবার নয়। অর্থের এই নিদারুণ অভাব আর সহ্য হয় না ব্রাহ্মণী, ভাগ্য পরীক্ষা করতে

চললাম। অর্থ পাই ত হাসতে হাসতে ঘরে ফিরব, নইলে এ ঘৃণিত জীবন শেষ হওয়াই ভাল।”

ব্রাহ্মণী অনেক বোঝালে, অনেক কান্নাকাটি করলে; বললে, “ওগো, এ ত তুমি আত্মহত্যাই করতে চলেছ!” কিন্তু দেবরাজ কোনও কথাই শুনলে না, একটি কঙ্কালসার মৃতকল্প টাট্টু ঘোড়া সংগ্রহ ক'রে তার পিঠে চ'ড়ে সিংহগড় অভিমুখে যাত্রা করলে।

পথে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করতে করতে চতুর্থ দিন দিবা তৃতীয় প্রহরকালে দেবরাজ সিংহ-গড়ের পশ্চিম তোরণ অতিক্রম ক'রে রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করলে। সেই মাজা-ভাঙা ঘিয়ে-ভাজা বিচিত্র অশ্ব, এবং তদুপরি রুক্ষকেশ ধূলিধূসর বিচিত্রতর অশ্বারোহীর অপূর্ব সমাবেশ দেখে পথচারী নাগরিকগণের কৌতুক এবং কৌতূহলের অন্ত রইল না। দেখতে দেখতে দেবরাজের পিছনে জনতা জ'মে গেল। সকলেই প্রশ্ন করে—কোথা থেকে আসছ, কোথায় যাবে, কার বাড়িতে অতিথি হবে? বিস্ময়াহত জনমণ্ডলীর কৌতূহল নিবারণের কোন প্রকার চেষ্টা না ক'রে দেবরাজ গম্ভীর বদনে সোজা রাজপ্রাসাদের অভিমুখে অশ্ব চালনা ক'রে চলল। এর পূর্বে সে দু-তিন বার সিংহগড়ে এসেছে—রাজপ্রাসাদের পথ তার অজানা নয়।

প্রাসাদের সিংহদ্বারে সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। প্রবেশোদ্যত দেবরাজের পথরোধ ক'রে আরক্ত নেত্রে কর্কশ কণ্ঠে সে বললে, "কোথা যাও?"

অকুতোভয়ে দেবরাজ বললে, "রাজপুরীতে।"

"কার কাছে?"

"মহারাজার কাছে।"

সরোষে প্রহরী তর্জন ক'রে উঠল, "স্পর্ধা ত তোমার কম নয় দেখছি! একটা কানাকড়ির ভিখিরী, তুমি মহারাজার কাছে যাবে?—পালাও এখান থেকে, নইলে এখনি তোমাকে বন্দী করব।"

অশ্বের উপর উপবিষ্ট দেবরাজের কোটরপ্রবিষ্ট দুই চক্ষু প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, "বন্দী করবে, না, শেষ পর্যন্ত এই কানাকড়ির ভিখিরীকে বন্দনা করবে, তা ঠিক বলা যায় না। আমি মহাচণ্ড শ্মশাননিবাসী হ্রীং-ক্রেট আখ্যাত তান্ত্রিক দেবরাজ উপাধ্যায়। ভৈরবীচক্র থেকে উঠে সোজা এসেছিলাম মহারাজকে রোগমুক্ত করতে। ঔষধ-প্রয়োগের আজ প্রশস্ত দিন ছিল, কিন্তু তুমি প্রতিবন্ধক হ'য়ে আমার গতিরোধ করলে। তুমি রাজদ্রোহী, রাজমৃত্যুকামী। তোমার বিরুদ্ধে রাজদরবারে অভিযোগ উপস্থিত ক'রে তোমার কর্মচ্যুতির পর তোমার স্থলে উত্তমসিংকে প্রতিষ্ঠিত করাব। আপাতত ফিরে চললাম।" ব'লে দেবরাজ লাগাম টেনে অশ্বের মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল।

'কানাকড়ির ভিখিরী'র অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার অকস্মাৎ একটা উৎকট জটিলতায় পরিণত হওয়ায় প্রহরী একেবারে হকচকিয়ে গেল। মহারাজার চিকিৎসার প্রতিবন্ধক হওয়ার গুরু অপরাধের বিরুদ্ধে দেবরাজ কর্তৃক রাজসমীপে অভিযোগ আনা এবং পরিণামে তার কর্মচ্যুতি ও অজানা অচেনা উত্তমসিংয়ের নিয়োগ—সমস্ত ব্যাপারটাকে ষোল আনা সন্দেহ অথবা উপেক্ষা করবার মতো তার মনের জোর রইল না। ওদিকে এক-পা এক-পা ক'রে দেবরাজ ফিরে চলেছে; দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলে তাকে সন্ধান ক'রে বার করা কঠিন হবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে প্রহরী ছুটে

গিয়ে দেবরাজের ঘোড়ার লাগাম ধ'রে টেনে নিয়ে এসে, কি বলবে সহসা ভেবে না পেয়ে, বললে, "শোন। উত্তমসিং কে ?"

অবলীলার সহিত দেবরাজ বললে, "মধ্যমসিংয়ের বড় ভাই।"

বিস্মিত হ'য়ে প্রহরী জিজ্ঞাসা করলে, "মধ্যমসিং আবার কে ?'

দেবরাজ বললে, "উত্তমসিংয়ের ছোট ভাই।"

সমস্যা কিছুমাত্র মন্দীভূত হ'ল না। এক মুহূর্ত চিন্তার পর প্রহরীর বুঝতে একটুও বাকি রইল না যে, মান-মর্যাদা লজ্জা-সঙ্কোচের অনুরোধে অন্ন-বস্ত্রের পাকা ব্যবস্থাকে সংশয়াপন্ন করার মত নির্বুদ্ধিতা আর নেই। তা ছাড়া, তান্ত্রিকদের প্রতি মনে মনে তার উৎকট ভীতি ছিল ; সুতরাং দেবরাজের প্ররোচনায় রাজাদেশে তার কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কাও যে মনের মধ্যে উদিত হয় নি তা নয়। মস্তক হ'তে শিরস্ত্রাণ উন্মোচিত ক'রে দেবরাজের সম্মুখে রেখে যুক্তকরে সে বললে, "উত্তমসিং-মধ্যমসিংদের আমি জানি নে। কিন্তু আপনি আমাকে অধমসিং ব'লে জানবেন। আমি আপনাকে বুঝতে পারি নি প্রভু। আমার অপরাধ মার্জনা করুন।"

দেবরাজ ধূর্ত ব্যক্তি ; কোথায় কোন্ জিনিস শেষ এবং কোন্ জিনিস আরম্ভ করা উচিত তা সে বিলক্ষণ বোঝে ; বললে, "তবে আমাকে মহারাজার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

প্রহরী বললে, "মহারাজার কাছে আপনাকে পাঠাবার অধিকার আমার নেই। প্রধান মন্ত্রীমশায় এখন রাজপ্রাসাদে মন্ত্রণাগারে আছেন, আমি আপনাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি সব ব্যবস্থা করবেন।"

দেবরাজ বললে, "বেশ, তাই দাও।"

অদূরে একজন টহলদার টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাকে ডেকে প্রহরী সব কথা বুঝিয়ে ব'লে তার সঙ্গে দেবরাজকে প্রধান মন্ত্রী বল্লভাচার্যের নিকট পাঠিয়ে দিলে।

একজন তান্ত্রিক চিকিৎসক রাজার চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হয়েছে—টহলদারের মুখে অবগত হ'য়ে সকৌতূহলে বল্লভাচার্য তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। অশ্বের উপর উপবিষ্ট দেবরাজের আকৃতি দেখে কিন্তু মনটা খারাপ হ'য়ে গেল।

দেবরাজকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বল্লভাচার্য বললেন, "আপনি মহারাজার রোগ সারাবেন?"

দেবরাজ অসঙ্কোচে বললে, "হ্যাঁ, সারাব বইকি।"

বল্লভাচার্য বললেন, "কিন্তু না সারাতে পারলে কি তার ফল তা জানেন ত?"

দেবরাজ বললে, "সব জানি মন্ত্রীমশায়, এই দীর্ঘ পথ এত কষ্ট ক'রে নিজের জীবন দিতে আসি নি, পরের জীবন দিতেই এসেছি। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না, এখান থেকে আমি অর্থোপার্জন ক'রেই যাব, প্রাণ দিয়ে যাব না।"

বল্লভাচার্য বললে, "ভগবানের অনুগ্রহে আপনি যেন এখান থেকে অর্থোপার্জন ক'রেই যান।"

দেবরাজ বললে, "কারুর অনুগ্রহের দরকার নেই মন্ত্রীমশায়, সে কার্য আমি নিজের বিদ্যেবুদ্ধির জোরেই ক'রে যাব।"

আরও ক্ষণকাল দেবরাজের সহিত আলাপ-আলোচনা ক'রে বল্লভাচার্য রাজসমীপে উপস্থিত হলেন।

এতদিন পরে একজন চিকিৎসক চিকিৎসা করবার জন্য উদ্যত হয়েছে শুনে রাজা উৎফুল্ল হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "শর্তের কথা জানে ত ?"

বল্লভাচার্য বললেন, "সম্পূর্ণ জানে। মহারাজকে সারাতে পারবে, সে বিষয়ে সে একেবারে নিঃসন্দেহ।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি জাতি ?"

বল্লভাচার্য বললেন, "ব্রাহ্মণ। তান্ত্রিক।"

বল্লভাচার্যের কথায় উৎফুল্ল হ'য়ে রাজা বললেন, "তান্ত্রিক ? তান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ওষুধ দেবে না-কি ?"

বল্লভাচার্য বললেন, "সেই রকমই ত বলে।"

রাজা বললেন, "সে কথা ভাল। ভেষজ-শক্তির সঙ্গে মন্ত্র-শক্তির যোগ হ'লে উপকার হবার সম্ভাবনা খুব বেশি।"

বল্লভাচার্য বললেন, "উপকার হ'লে ত আমরা বেঁচে যাই মহারাজ, কিন্তু তার চেহারা দেখলে একটুও শ্রদ্ধা হয় না।"

রাজা বললেন, "তা হোক। তান্ত্রিকদের চেহারা দেখতে ভাল হয় না। ডাকান তাকে এখনি আমার কাছে।"

তথাপি দেবরাজ এলে তার মূর্তি দেখে রাজার উৎসাহ অনেকটা ক'মে গেল ; বললেন, "আমাকে তুমি সারাতে পারবে ?"

দেবরাজ বললেন, "নিশ্চয় পারব।"

রাজা বললেন, "তিন মাসের মধ্যে ?"

রাজার প্রতি তর্জনী আস্ফালিত ক'রে দেবরাজ বললে, "তিন মাস বলছেন কি মহারাজ ! তিন দিনে আপনাকে সারিয়ে দোব।"

রাজা বললেন, "তুমি পাগল।"

দেবরাজ বললে, "মহারাজ, এ পর্যন্ত যাঁরা আপনার চিকিৎসা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ পাগল ছিলেন ;"

রাজা বললেন, "না, তাঁদের মধ্যে কেউ পাগল ছিলেন না।"

করজোড়ে দেবরাজ বললে, "মহারাজ, অপরাধ মার্জনা করবেন,— সুস্থ মস্তিষ্কের লোকেরা যখন কোন সুবিধেই করতে পারে নি, তখন পাগলকেই একবার পরীক্ষা ক'রে দেখুন না। আর, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন যে ব্যক্তির মহাচণ্ড শ্মশানে কুম্ভক যোগের দ্বারা শিববিন্দুর চতুর্দিকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে কাটে, সে পাগল নয় ত কি ? আমি আপনার কাছে প্রাণ দিতে আসি নি মহারাজ। মহাচণ্ড শ্মশানে উৎকটভৈরবের যে মন্দিরগুহা নির্মাণ করব, আমি এসেছি আপনার কাছ থেকে তার অর্থ সংগ্রহ করতে। 'আমি আপনাকে নিঃসন্দেহে ব'লে রাখছি, আজ থেকে চার দিনের দিন এই পাগলের হাতে গুনে গুনে এক লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা আপনাকে দিতে হবে।"

উৎসাহিত হ'য়ে রাজা বললেন, "তা যদি হয় ত এক লক্ষ নয়, দু' লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তোমাকে দোব ; কিন্তু তা যদি না হয়, তা হ'লে—"

সূর্যপালকে শেষ করবার অবসর না দিয়ে দেবরাজ বললে, "এ বিষয়ে আর 'কিন্তু' নেই মহারাজ, একেবারে নিশ্চয়। আজ সন্ধ্যা-বেলা আমি ওষুধ নিয়ে আসব আর সেই সময়ে ঔষধ সেবনের নিয়ম আপনাকে ব'লে দোব। আপাততঃ, আপনার রাশি কি আমাকে বলুন।"

সূর্যপাল বললেন, "সিংহ রাশি।"

দেবরাজ বললে, "আর মহারাণীর ?"

সূর্যপাল বললেন, "বৃষ রাশি !"

নিজের বাম চক্ষু বন্ধ ক'রে দক্ষিণ চক্ষু দিয়ে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে দেবরাজ বললে, "মহারাজ, আপনি দক্ষিণ চক্ষু বন্ধ ক'রে বাম চক্ষু দিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে একটু তাকিয়ে থাকুন।"

সূর্যপাল তাই-ই করলেন। কি করেন, তান্ত্রিক চিকিৎসকের হয়ত কোন মন্ত্র-প্রক্রিয়াই বা হবে!

এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে দেবরাজ বললে, "এবার ঠিক উল্টো—আপনি দক্ষিণ, আমি বাম।"

সূর্যপাল বাম চক্ষু বন্ধ ক'রে দক্ষিণ চক্ষু দিয়ে দৃষ্টিপাত করলেন।

দেবরাজ বললে, "হয়েছে, এবার দুই চোখ খুলুন। কোন ভয় নেই মহারাজ, তিন দিনেই আপনাকে সুস্থ ক'রে দোব। তবে রোগ-শান্তির পর 'তুষ্টস্য দানং রবিনন্দনস্য' করতে হবে।"

সকৌতূহলে রাজা বললেন, "সে কি?"

দেবরাজ বললে, "সে অতি সামান্য ব্যাপার, যথাকালে জানতে পারবেন। এখন আমি চললাম, সন্ধ্যার সময়ে আসব।"

রাজা বললেন, "ঔষধ-সেবনের নিয়ম পালনের কথা বলছিলে, নিয়ম খুব কঠিন না-কি?"

দেবরাজ বললে, "আজ্ঞে না মহারাজ, অতি সহজ নিয়ম, শুনলেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু কঠিনই হোক আর সহজই হোক, নিয়ম পালন না করলে ওষুধে উপকার হবে কেন বলুন?"

রাজা বললেন, "সে ত সত্যি কথা। তোমার কোন চিন্তা নেই, নিয়ম পালন আমার দ্বারা বর্ণে বর্ণে হবে।"

প্রসন্নমুখে দেবরাজ বললে, “তা হ’লেই হ’ল। বিশেষতঃ এই চিকিৎসায় যখন আমারও জীবন-মরণের কথা জড়িত।”

রাজা বললেন, “সত্যিই ত।” তার পর বল্লভাচার্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ক’রে বললেন, “ব্রাহ্মণকে নিয়ে গিয়ে আহার এবং বাসস্থানের উত্তম ব্যবস্থা ক’রে দিন।”

“যে আজ্ঞে” ব’লে দেবরাজকে নিয়ে বল্লভাচার্য প্রস্থান করলেন।

সন্ধ্যার পর রাজ-অন্তঃপুরে রাজা ও রাণী দেবরাজেরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন, এমন সময়ে একজন পরিচারিকা এসে সংবাদ দিলে—দেবরাজ এসেছে।

রাজা বললেন, "নিয়ে এস এখানে।"

একটু পরেই পরিচারিকার সহিত দেবরাজ প্রবেশ করলে। হাতে তার স্বুবর্ণ পাত্রে ঈষৎ লালচে রঙের খানিকটা তরল পদার্থ। বলা বাহুল্য, স্বুবর্ণ পাত্রটি রাজভাণ্ডার হ'তে সংগৃহীত, এবং পাত্রের ঔষধ সাধারণ লালরঙ-মিশ্রিত খাঁটি জল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

দেবরাজকে দেখে রাজা ও রাণী আসন পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। মহারাণী চন্দ্রশীলা ভক্তিভরে দেবরাজকে প্রণাম করলেন।

দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত ক'রে দেবরাজ বললে, "জয় হোক্ মহারাণী মহারাজার!" তার পর স্বুবর্ণ পাত্রটি চন্দ্রশীলার হাতে দিয়ে বললে, "মহারাজ, আপনার ওষুধ এনেছি।"

রাজা বললেন, "ওষুধ খাবার নিয়ম কি বলুন?"

দেবরাজ বললে, "আজ থেকে ঔষধ-সেবনের তিন রাত্রি আপনি মহারাণীকে আপনার দক্ষিণ পাশে নিয়ে এক পালঙ্কে পূর্ব শিয়রে শয়ন করবেন। এই পাত্রটি সমস্ত রাত পালঙ্কের ঈশান কোণে রাখা থাকবে। প্রত্যুষে উঠে মহারাণী বাসি কাপড়ে আপনার হাতে

ওষুধ দেবেন। আপনিও বাসি কাপড়ে পূর্বমুখে ব'সে সমস্ত ওষুধটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলবেন। দিনের মধ্যে একবার মাত্র ওষুধ খাওয়া। আবার কাল সন্ধ্যায় যে ওষুধ দিয়ে যাব, পরশু প্রত্যুষে তা খাবেন।"

রাজা বলবেন, "মাত্র এই ? আর কোন নিয়ম নেই ?"

দেবরাজ বললে, "আর একটি মাত্র নিয়ম আছে। নিদিধ্যাসনে দেখা গেল, আপনার এ ব্যাধির মধ্যে উষ্ট্রিকা দোষ আছে,—ওষুধ খাবার সময় আপনি কদাচ উট মনে করবেন না। উট মনে করলে উপকার তো হবেই না, উল্‌টে অপকার হবে। উট মনে পড়লে সেদিন আর ওষুধ খাবেন না।"

সকৌতূহলে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "উট কি ?"

দেবরাজ বললে, "এই—জন্তু উট। হাতী, ঘোড়া, উট—বলে না ? সেই উট। লম্বা গলা, পিঠে কুঁজ।"

রাজা বললেন, "অত ক'রে বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি। আমার নিজের উটশালাতেই তো হাজারো উট আছে।" তার পর এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে বললেন, "না, না, উট মনে করব কেন ? উট মনে করবার কি কারণ আছে !"

দেবরাজ বললে, "তা হ'লেই হবে। তা হ'লে তিন দিনে আরাম। তা যদি না হয় তা হ'লে আমি নিজে গিয়ে শূলে চ'ড়ে বসব মহারাজ।"

দেবরাজের কথা শুনে রাজা ও রাণী উভয়েই খুব সন্তুষ্ট হলেন। আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে তাঁদের মনের মধ্যে প্রবল আশা দেখা দিলে।

পরদিন প্রত্যুষে ঈশান কোণে থেকে ঔষধের পাত্রটি নিয়ে মহারাণী চন্দ্রশীলা সযত্নে স্বামীর হাতে দিলেন। পূর্ব দিকে মুখ ক'রে সূর্যপাল প্রস্তুত হ'য়েই ব'সে ছিলেন, ইষ্টদেবতা স্মরণ ক'রে ঔষধ পান করতে গিয়ে পাত্রটা মুখে ঠেকিয়েই ভূমির উপর ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলেন।

উৎকণ্ঠিত স্বরে চন্দ্রশীলা বললেন, "কি হ'ল? খেলেন না কেন মহারাজ?"

অপ্রতিভ মুখে সূর্যপাল বললেন, "উট মনে প'ড়ে গেল।"

শুনে রাণী শিউরে উঠলেন; বললেন, "আগে থেকেই মনে পড়ছিল, না, খেতে গিয়ে মনে পড়ল?"

রাজা বললেন, "খেতে গিয়ে মনে পড়ল।"

নিঃশব্দে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে রাণী বললেন, "কি আর করবেন বলুন, এক্ দিন পেছিয়ে গেল। কাল আর মনে করবেন না।"

মনে মনে কি ভাবতে ভাবতে রাজা বললেন, "না, তা আর করব না।"

সন্ধ্যাবেলা ওষুধ দিতে এসে সব কথা শুনে দেবরাজ মুখ গম্ভীর করলে। বললে, "মহারাজ, এত ক'রে যে কথাটা নিষেধ ক'রে দিলাম, শেষ পর্যন্ত তাই ক'রে বসলেন?"

অপ্রতিভ হ'য়ে সূর্যপাল বললেন, "কি করি বল? ইচ্ছে ক'রে করেছি কি? হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল।"

দেবরাজ বললে, "তার আগেই টপ্ ক'রে খেয়ে ফেললে ত হ'ত!"

অন্যমনস্কভাবে রাজা বললেন, "কাল না-হয় তাই করব।" তার পর মনে মনে ক্ষণকাল কি চিন্তা ক'রে বললেন, "দেখ দেবরাজ, এ নিয়মটা তুমি যদি আমাকে না জানাতে তা হ'লে এমনি-এমনিই পালন হ'য়ে যেত। জানিয়েই অসুবিধেয় ফেলেছ।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে দেবরাজ বললে, "বলেন কি মহারাজ! এর উপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে, না জানিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারি কি? হঠাৎ যদি আপনি উটের কথা মনে ক'রে ফেলেন, তা হ'লে?"

রাজা মৃদু ভাবে আপত্তি করলেন; বললেন "না, না, হঠাৎ উটের কথাই বা মনে করতে যাব কেন?"

দেবরাজ বলবেন, "এই যে আপনি বললেন, আপনার উটশালায় হাজারো উট আছে?"

রাজা বললেন, "কি গেরো! শুধু কি আমার উটশালাই আছে! হাতীশালা নেই? ঘোড়াশালা নেই?"

দেবরাজ বললে, "কিন্তু মহারাজ, উটশালাও ত আছে।"

রাজা আর তর্ক করলেন না—পরদিন নিয়ম পালন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেবরাজকে বিদায় দিলেন।

পরদিনও কিন্তু একই ব্যাপার ঘটল, মুখে ঠেকিয়েই ঔষধের পাত্র নামিয়ে রাখতে হ'ল, উট মনে পড়ায় ঔষধ খাওয়া চলল না। তৎপরদিন থেকে ঔষধের পাত্র স্পর্শ করাও চলল না, আগে থেকেই উটের কথা মনে পড়তে থাকে।

মহারাণী চন্দ্রশীলা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। ওষুধ খাবার সময় যাতে উটের কথা রাজার মনে না পড়ে সে জন্য তিনি রাজাকে নানা প্রকারে অন্যমনস্ক করতে চেষ্টা করেন; মিথ্যা ক'রে বলেন, "মহারাজ, আপনার হাতীশালায় আজ লছমনদাসের ভারি অসুখ, এক কুটো ডাল-পালা মুখে দেয় নি আর স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি শুঁড় নাড়ছে।"

লছমনদাস রাজার সর্বাপেক্ষা প্রিয় হস্তী। কিন্তু শাক দিয়ে কখনও মাছ ঢাকা চলে? লছমনদাসের দীর্ঘ আন্দোলিত শুঁড় রাজার মনে ঢুনডিনাথের লম্বা গলা রূপে উঁচু হ'য়ে দেখা দেয়,—রাজা ধীরে ধীরে অ-সেবিত ঔষধের পাত্র ভূমিতলে নামিয়ে রাখেন। ঢুনডিনাথ রাজার সবচেয়ে আদরের উট—খাস আরব দেশ থেকে বহু যত্নে এবং বহু অর্থ-ব্যয়ে সংগ্রহ করা।

মহারাণী চন্দ্রশীলার দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। মনে মনে বলেন, 'তোমার অপরাধ কি মহারাজ! আমার নিজেরই মন ক্রমশঃ এক উটশালায় পরিণত হয়েছে!'

এমনি ভাবে মাসাধিক কাল গত হ'ল। সূর্যপালের পেটে এক বিন্দু ঔষধ প্রবেশ করল না, ওদিকে রাজার-হালে চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহারে দেবরাজের শরীর দিন দিন কান্তিমান হ'য়ে উঠছে। ঔষধ দিতে এসে দেবরাজ গজগজ করে; বলে, "মহারাজ, মনে করেছিলাম দিন চারেকে

কার্য শেষ ক'রে বাড়ী ফিরব, কিন্তু আপনি এমনি ছেলেমানুষি আরম্ভ করেছেন যে, দেখতে দেখতে এক মাস হ'য়ে গেল। ও-দিকে বাড়ীতে কত প্রয়োজনীয় কাজ পণ্ড হচ্ছে।"

রাজা কিছু বলেন না, বেকায়দায় প'ড়ে গেছেন, মনের আক্রোশ মনের মধ্যে চেপে চুপ ক'রে থাকেন।

আর দিন পনের পরে কিন্তু সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে। বল্লভাচার্যকে আর দেবরাজকে রাজা ডাকিয়ে পাঠালেন।

উভয়ে উপস্থিত হ'লে দেবরাজের প্রতি সক্রোধ নেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে রাজা বললেন, "দেবরাজ, তুমি একটি বিষম ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড, জোচ্চোর।"

কাঁচুমাচু মুখে করজোড়ে দেবরাজ বললে, "কেন মহারাজ?"

কঠোর কণ্ঠে রাজা বললেন, "আবার চালাকি করছ? কেন, তা জান না?"

দেবরাজ কোন কথা বললে না, করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বললেন, "আমার আগেকার রোগ সেরে গেছে, তার বিন্দু-বিসর্গও আর নেই। কিন্তু তার জায়গায় নতুন যে রোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্যে পাগল হ'য়ে যাবার মতো হয়েছি। আগেকার রোগ এর চেয়ে ভাল ছিল। তার শেষ ছিল মৃত্যুতে, কিন্তু এ রোগে বেঁচে থেকে দিবারাত্র মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছি।"

রাজার কাতরোক্তি শুনে দেবরাজের হাসি পেয়েছিল। অতি কষ্টে হাসি চেপে গম্ভীর মুখে সে বললে, "কি রোগ মহারাজ?"

রাজা সজোরে চীৎকার ক'রে উঠলেন, "হারামজাদা, আবার ন্যাকামি করছ! উট-রোগ তা তুমি জান না?"

শুনে মন্ত্রী বল্লভাচার্য চমকে উঠলেন ; বললেন, "বলেন কি মহারাজ ! উট-রোগ ?"

রাজা বললেন, "হ্যাঁ, উট-রোগ। ওই নচ্ছারটা একটা আস্ত উট আমার মনের মধ্যে ঢুকিয়েছে। ঘুমিয়ে পর্যন্ত নিস্তার নেই, স্বপ্ন দেখি উটের। ঘুম ভাঙলে মনে হয়, উট। উট ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি। জেগে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ মনের মধ্যে উট খট্‌খট্ ক'রে বেড়িয়ে বেড়ায়।" তারপর দেবরাজের দিকে আরক্ত নেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "বার কর্ এ উট আমার মনের ভেতর থেকে, নইলে তোকে শূলে চড়িয়ে, আগুনে পুড়িয়ে মারব।"

মনের অপরিসীম উল্লাস অতি কষ্টে মনের মধ্যে দমন ক'রে দেবরাজ বললে, "মহারাজ, প্রথম দিনেই ত বলেছিলাম যে নিদিধ্যাসনে দেখা গিয়েছিল আপনার রোগে উষ্ট্রিকা দোষ —"

দেবরাজকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রাজা চীৎকার ক'রে উঠলেন, "চোপ রও পাষণ্ড ! ফের যদি উষ্ট্রিকা দোষের কথা উচ্চারণ করেছ, এক্ষুণি দু খণ্ড করব তোমাকে।" ব'লে কোষ থেকে অসি নিষ্কাসিত করলেন।

দেবরাজ দেখলে, আর বেশী বাড়াবাড়ি ক'রে কাজ নেই। করজোড়ে বললে, "দোহাই মহারাজ ! দয়া ক'রে ও-কার্যটি করবেন না। প্রাণটা দেহে বর্তমান থাকলে উটের যা-হয় একটা ব্যবস্থা করতে পারব, কিন্তু না থাকলে উটকে কোন মতেই বার করতে পারব না। এর অতি সহজ প্রতিকার আছে, অভয় দেন ত নিবেদন করি।"

রাজা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "কি ?"

দেবরাজ বললে, "আপনার পায়ের শির ত আর টন্‌টন্‌ করে না ?"

রাজা বললেন, "না।"

"বুক ধড়ফড় করে না ?"

"না।"

"চোখ লাল হয় না ?"

"না।"

দেবরাজ বললে, "মহারাজ, তা হ'লে ত আপনার আসল রোগ একেবারে সেরে গিয়েছে। আপনার প্রতিশ্রুত দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে আমাকে বিদায় করুন, তা হ'লে আপনার মন থেকে বেরিয়ে এসে উটও আমার পিছনে পিছনে খট্‌খট্‌ করতে করতে চ'লে যাবে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে রাজা বললেন, "আমারও তাই মনে হয়। মন্ত্রীমশায়, এই শয়তানটাকে দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে লাথি মেরে বিদায় করুন।"

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, এর এক ফোঁটা ওষুধ আপনার পেটে গেল না, আর দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা একে দিতে বলছেন ?"

রাজা বললেন, "এই সর্বনেশে লোককে আর একদিনও আমাদের রাজ্যে রাখবেন না। ওর হাত থেকে পরিত্রাণ না পেলে শেষ পর্যন্ত ও আপনার মনে হাতী ঢুকিয়ে ছাড়বে। তখন চার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ওকে বিদায় করতে হবে।"

এই অত্যন্ত আশঙ্কাজনক কথা শোনবার পর মন্ত্রী আর দ্বিরুক্তি করলেন না, দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দেবরাজকে বিদায় দিলেন।

সেই বিপুল বহুমূল্য অর্থ ষোলখানা মজবুত বোরায় পুরে আটটা

ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে দশ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী রক্ষীর দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে প্রফুল্লমুখে দেবরাজ নিজের সেই মাজা-ভাঙা ঘোড়ার উপর সমাসীন হ'য়ে চৈতসা অভিমুখে যাত্রা করলে। বলা বাহুল্য, রাজবাড়ীর পুষ্টিকর দানা-পানির গুণে দেবরাজের সেই ঘিয়ে-ভাজা ঘোড়াও অনেকটা বলিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল।

রাত্রে মহারাণী চন্দ্রশীলা পূর্বের মত রাজার বাম পার্শ্বে শয়ন করলেন। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর সূর্যপালকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, কাল রাত্রে আপনার সুনিদ্রা হয়েছিল ত?"

প্রসন্নমুখে রাজা বললেন, "হ্যাঁ, সমস্ত রাত।"

"স্বপ্ন দেখেছিলেন?"

"দেখেছিলাম।"

সভয়ে মহারাণী জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের স্বপ্ন?"

সহাস্যমুখে রাজা বললেন, "উটের স্বপ্ন একেবারেই নয়; শুধু তোমার স্বপ্ন।"

সূর্যপালের কথা শুনে লজ্জায় এবং আনন্দে মহারাণীর মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। মনে মনে ভাবলেন, উটটা তা হ'লে সত্য সত্যই দেবরাজের সহিত প্রস্থান করেছে।

[প্রচলিত প্রাচীন কাহিনীর ছায়াবলম্বনে]

বর্ষা-দিনের কাব্য

বেলা তখন তিনটা। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে রঘুনাথ ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছে। সাড়ে চারটার সময় ভবানীপুরে এক বন্ধুর গৃহে চা-পানের নিমন্ত্রণ। পথে অন্য একটা কাজ সেরে যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হ'তে হবে।

ভাদ্র মাস। বর্ষাটা এ বৎসর পিছন দিকেই প্রবল হ'য়ে নেবেছে। বাড়ী থেকে বাহির হবার পূর্বেই পূর্বদিকের আকাশে জল-ভরা ঘন মেঘ দেখা দিয়েছিল। অবিলম্বে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দেখে রঘুনাথের মাতা জোর ক'রে রঘুনাথের হাতে একটি ছাতা দিয়েছিলেন। কারণ, আধুনিক কালের অধিকতম তরুণদের মতো রঘুনাথেরও সুতীব্র ছাতা-বিদ্বেষ ছিল ; রৌদ্র এবং বৃষ্টির অসুবিধা অপেক্ষা ছাতা বহন ক'রে বেড়ানোর দুঃখকে সে অনেক বেশী পীড়াদায়ক ব'লে মনে করে। তা ছাড়া, তুচ্ছ সুখ-সুবিধার জন্য একটা জটিল এবং অপুরুষোচিত যন্ত্রের দ্বারা নিজের দেহকে বিড়ম্বিত ক'রে বেড়ালে দুঃখ-সুখ-নিরপেক্ষ সুদৃপ্ত তারুণ্যের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করা হয় ব'লে তার ধারণা। ছাতা নিতে সে যথেষ্ট আপত্তি করেছিল, কিন্তু জননীর অনুরোধ শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করতে পারে নি। তাই কি ছোট-খাট ছাতা ? ছাব্বিশ ইঞ্চি ত বটেই, হয়ত আটাশ ইঞ্চিই বা হবে ! মেঘ এবং ছাতাকে মনে মনে অভিসম্পাত দিতে দিতে রঘুনাথ ওয়েলিংটনের মোড়ে এসে উপস্থিত হ'ল।

ক্ষণকাল পরে অদূরে একটা ট্রাম দেখা দিলে—শ্যামবাজার থেকে আসছে। কিন্তু ট্রাম-স্টপে থামবার কিছু পূর্বেই চড়চড় ক'রে বৃষ্টি এসে পড়ল। অগত্যা রঘুনাথকে ছাতা খুলতে হ'ল। উঃ! কি ঢাউস ছাতা! চার জন লোককে আশ্রয় দিতে পারে এত বড়!

ট্রাম যখন রঘুনাথের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। পথে রঘুনাথ ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো আরোহী ছিল না। ছাতা বন্ধ ক'রে ট্রামে উঠতে গেলে জামা-কাপড় একেবারে ভিজে যাবে, তাই সে স্থির করলে ফুটবোর্ডে উঠে দাঁড়িয়ে তারপর ছাতা বন্ধ করবে। ট্রামের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে কিন্তু সে ট্রামে উঠতে পারলে না,—ঠিক তার সম্মুখে আঠারো-উনিশ বছরের একটি তরুণী মেয়ে বাঁ হাতে চার-পাঁচখানা বই আর খাতা নিয়ে ট্রাম থেকে টপ ক'রে নেবে পড়ল; তারপর পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হবার অসুবিধার জন্যই হোক, অথবা আত্মরক্ষার অবুঝ প্রবৃত্তি বশতঃই হোক, একেবারে সোজা রঘুনাথের ছাতার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এই অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক পরিণতির জন্য রঘুনাথ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না; কি করা উচিত হঠাৎ স্থির করতে না পেরে মেয়েটির ডান হাতে ছাতাটা ধরিয়ে দিয়ে সে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে নির্বিকল্পতার সহিত ভিজতে লাগল।

ছাতা হাতে নিয়ে চকিত হ'য়ে উঠে মেয়েটি বললে, "এ কি!"

পাশ থেকে মুখ নীচু ক'রে মেয়েটির প্রতি তাকিয়ে দেখে রঘুনাথ বললে, "ছাতা নিশ্চয়ই।"

"না, তা বলছি নে—"

"যা বলছেন ফুটপাথে উঠে বলুন, মোটর আসছে।"

হর্ন দিতে দিতে সবেগে একটা বৃহৎ ট্যাক্‌সি একেবারে নিকটে এসে পড়েছিল, ঘটনা-বিহ্বলতা বশতঃ উভয়েই সময়মতো তেমন খেয়াল করে নি। তা ছাড়া, মেয়েটির মনোযোগের বোধ হয় ষোল আনাই বৃষ্টি, রঘুনাথ এবং রঘুনাথের সুবৃহৎ ছাতার মধ্যেই নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছিল। সজোরে মেয়েটির বাম বাহু চেপে ধ'রে হিড়হিড় ক'রে রঘুনাথ তাকে ফুটপাথে টেনে আনলে, এবং পর-মুহূর্তেই জল ছিটোতে ছিটোতে সেই বৃহৎ মোটরখানা হুস ক'রে বেরিয়ে গেল।

রঘুনাথ বললে, "মাফ করবেন, অমন ক'রে আপনাকে টেনে আনা ভিন্ন উপায় ছিল না।"

এই কথার উত্তরে মেয়েটির মুখ দিয়ে ভদ্রতার কোনো বাণী নির্গত হ'ল না। মাফ করবার মতো কোনো অপরাধ হয় নি, সে কথা বললে না; ধন্যবাদ ত জানালই না;—কাঁদো-কাঁদো স্বরে বিরক্তিবিরূপ মুখে বললে, "মাগো, কি বিপদেই পড়লুম!"

আপত্তিব্যঞ্জক ভঙ্গিতে রঘুনাথ বললে, "পড়লুম বলছেন কেন? বলা উচিত, পড়েছিলাম। বিপদ ত কেটে গেল। সত্যিই মোটরটা একটা মস্ত বড় বিপদের মতো প্রায় ঘাড়ের উপর এসে পড়ছিল।" তারপর এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বললে, "কিন্তু, আমাকেই বিপদ মনে করছেন না ত আপনি?"

মনে করছে না—সে কথা ইঙ্গিতেও ব্যক্ত না ক'রে মেয়েটি ব্যগ্রভাবে রাস্তার দুই দিকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করলে, "অমন ক'রে কি দেখছেন?"

"খালি রিক্‌শ।"

"বৃষ্টির সময়ে খালি রিকৃশ সহজে পাবেন না।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মেয়েটি বললে, "ট্রাম ত' চ'লে গেল, আপনি গেলেন না কেন ?"

রঘুনাথ বললে, "আপনি নাবার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ডাক্টার ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম ছেড়ে দিলে। যে-রকম অবলীলার সঙ্গে আপনি আমার ছাতার মধ্যে ঢুকে পড়লেন তাতে হয়ত সে মনে করেছিল, আমি আপনার জন্যই ছাতা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম।"

মেয়েটি কোনো মতেই অস্বীকার করতে পারলে না যে, যেভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল তাতে ওরূপ মনে করা কণ্ডাক্টারের পক্ষে অসমীচীন নয়। কিন্তু অপর এক দিক দিয়ে আপত্তি করতে সে ছাড়লে না ; বললে, "গাড়ির দরজার সামনে অত বড় ছাতা খুলে দাঁড়িয়ে থাকলে না ঢুকে কি করি ! তার উপর টপ ক'রে আপনি ছাতাটা আমার হাতে দিয়ে দিলেন !" ঈষৎ বিরক্তিব্যঞ্জক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "আচ্ছা, কেন দিয়ে দিলেন বলুন ত ?"

চিন্তিত মুখে রঘুনাথ বললে, "বোধ হয়, আপনি নিয়ে নেবেন মনে ক'রে।"

রঘুনাথের উত্তর শুনে মেয়েটি চুপ ক'রে গেল, এ কৈফিয়তের কোনো প্রতিবাদ সহসা সে খুঁজে পেলে না ; কারণ, নিয়ে যে সে নিয়েছে তার প্রমাণ তার আপন হাতেই অবস্থান করছে। মনে মনে বললে, ভাববার-চিন্তাবার সময় না দিয়ে অমন ক'রে হাতে ধরিয়ে দিলে না নিয়ে কি যে করা যায় তা ত জানি নে।

মেয়েটির কৃতজ্ঞতাবর্জিত অকোমল ভাব উপলব্ধি ক'রে মনে মনে পুলকিতই হ'য়ে রঘুনাথ বললে, "জীবনে কোনো দিন ছাতা ব্যবহার করি নি, আজ প্রথম ব্যবহার ক'রেই ভারি বিপদে প'ড়ে গেছি। ছাতা না থাকলে আমি পথ থেকে ভিজতে ভিজতে ট্রামে উঠতাম, আপনিও পথে নেমে ভিজতে ভিজতে বাড়ী যেতেন—সে দেখছি এক রকম ভালই হ'ত।—এই হতভাগা ছাতার দ্বারা আমার সঙ্গে আপনাকে জড়িত ক'রে একটা বিশ্রী গোলযোগের সৃষ্টি করেছি! এ যেন ঠিক জাতও গেল, অথচ পেটও ভরল না।"

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মেয়েটি বললে, "তার মানে?"

"তার মানে, নিজেও ভিজলাম, আপনাকেও বিরক্ত করলাম।" ব'লে রঘুনাথ হেসে উঠল।

এ ব্যাখ্যার ভাষায় কতকটা শান্ত হ'য়ে মেয়েটি আর কিছু বললে না, শুধু ক্ষণিকের জন্য অপাঙ্গে রঘুনাথের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

শ্যামবাজারের দিক থেকে আর একটি ট্রাম দেখা দিয়েছিল। মেয়েটি বললে, "ট্রাম আসছে, এই নিন আপনার ছাতা।" ব'লে ছাতাটা রঘুনাথের দিকে এগিয়ে ধরলে।

মেয়েটির দিকে ছাতাটা ঠেলে দিয়ে রঘুনাথ বললে, "দেখুন, মিছি-মিছি ছেলেমানুষি করবেন না। আমি ছাতা নিলে কার উপকার হবে বলুন ত? আমি ত ভিজে গিয়েইছি, উপরন্তু আপনিও ভিজে যাবেন, বইখাতাগুলোও নষ্ট হবে। এই ভিজে কাপড়ে আমার এখন ভবানীপুরে গিয়েও কোনো লাভ হবে না। তার চেয়ে চলুন, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে

দিয়ে আমি বাড়ী ফিরে যাই। যে রকম চেপে বৃষ্টি এল তাতে এখনি রাস্তায় এমন জল জ'মে যাবে যে, অবশেষে জুতো হাতে ক'রে পথ চলতে হবে।"

মেয়েটি বললে, "একটা রিক্‌শ আসছে, দেখি খালি কি-না!"

রঘুনাথ বললে, "রিক্‌শয় ত পর্দা ফেলা রয়েছে।"

"বৃষ্টির সময়ে খালি রিক্‌শতেও পর্দা ফেলে রাখে।"

কথাটা সত্য, সুতরাং রিক্‌শটা কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'ল। কিন্তু কাছে এলে দেখা গেল, সেটা খালি নয়, লোক আছে।

রঘুনাথ বললে, "দেখলেন ত, লোক রয়েছে। এখন দশ-বারোখানা রিক্‌শ ত দেখলেন, কোনোটাই খালি নয়। আপনি ভয় পাবেন না, অসঙ্কোচে আমার সঙ্গে চলুন। আমি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে পারব যে, রিক্‌শওয়ালার চেয়ে আমি মন্দ লোক নই।"

রঘুনাথের এ কথায় মেয়েটি ব্যস্ত হ'য়ে উঠে বললে, "না, না, আপনি এ-সব কথা বলছেন কেন? এখান থেকে আমার বাড়ী পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। আপনি আর কত কষ্ট করবেন!"

আসল কথা, একজন অপরিচিত যুবকের সহিত তার ছাতা মাথায় দিয়ে গৃহে উপস্থিত হওয়া মেয়েটির একেবারেই মনঃপূত হচ্ছিল না।

রঘুনাথ বললে, "কষ্ট আর আনন্দের হিসেব নিজের নিজের বাড়ী পৌঁছে করলেই হবে। আপাততঃ কোন্ দিকে আপনার বাড়ী বলুন ত?"

পশ্চিম দিকে হস্ত প্রসারিত ক'রে মেয়েটি বললে, 'নতুন রাস্তা দিয়ে খানিকটা গিয়ে ডান-হাতি একটা গলির মধ্যে।"

"আসুন, ঠিক আমার পিছনে পিছনে আসুন।" ব'লে রঘুনাথ ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে পড়ল। মেয়েটিও ছাতা মাথায় দিয়ে রঘুনাথকে অনুসরণ ক'রে চলল।

একটি অপরিচিতা সুন্দরী তরুণীকে নিজের ছাতা দিয়ে, নিজে ভিজতে ভিজতে অগ্রগামী হ'য়ে পথ চলা—বর্ষা-দিনের এই অনাস্বাদিত-পূর্ব কাব্য-সংঘটন—রঘুনাথের মনে এক বিচিত্র আনন্দের সঞ্চার করছিল।

অপর দিকের ফুটপাথে উঠে দ্রুতগতিশীল ট্রাম, বাস ও মোটরের আশঙ্কা থেকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সে বললে, "পথের ও-দিক পর্যন্ত এই ছাতাটার ওপর একটা বিশ্রী রকম বিরক্তিতে মন বিষিয়ে ছিল। এখন কিন্তু মনে হচ্ছে, ছাতাটা এনে ভালই হয়েছে, উপকারে লাগল।"

রঘুনাথের পিছনে অবস্থান ক'রে মেয়েটির একটু সাহস হয়েছিল; বললে, "উপকারে ত লাগল আমার।"

"সেই জন্যেই ত বলছি, এনে ভাল হয়েছে।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে মেয়েটি বললে, "এই রকম ভিজতে ভিজতে আপনি বরাবর যাবেন?"

প্রশস্ত ফুটপাথ, বৃষ্টির জন্য জনবিরল। একটু পেছিয়ে এসে মেয়েটির পাশাপাশি হ'য়ে রঘুনাথ বললে, "উপায় কি বলুন? আমাদের দুজনের ত এক ছাতার মধ্যে স্থান হ'তে পারে না। জানেন ত, আপনাদের পক্ষে আমরা অস্পৃশ্য প্রাণী।" ব'লে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

মেয়েটি সত্য সত্যই অপ্রতিভ হ'ল। এ কথার পর ছাতার মধ্যে রঘুনাথকে আহ্বান না করলে তার উক্তিকে সপ্রমাণ করাই হয়।

মেয়েটির বিমূঢ় অবস্থা বুঝতে পেরে রঘুনাথ তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলে। বুক-পকেট থেকে একটা রেশমের মনিব্যাগ বার ক'রে বললে, "আপনি বরং আপাততঃ এই ভিজে মনিব্যাগটা আপনার হাতে রাখুন—ছাতা যখন নেব তখন এটাও নেব অখন। মনিব্যাগটা ভিজে হয়ত তত ক্ষতি হয় নি, কিন্তু ভেতরের কাগজের টাকাগুলো বেশী ভিজে গেলে সত্যিই কিছু ক্ষতি হবে।" ব'লে ব্যাগটা মেয়েটির দিকে প্রসারিত ক'রে ধরলে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যাগটা নিতে হ'ল ; কারণ এই যৎসামান্য উপকার-টুকু করার বিরুদ্ধে আপত্তি করবার মতো তেমন গুরুতর কোনো যুক্তি হঠাৎ দেখানো গেল না।

চলতে চলতে রঘুনাথ বললে, "আপনি কি পড়েন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

মেয়েটি বললে, "আই. এস-সি।"

"কোন্ ইয়ার ?"

'সেকেণ্ড ইয়ার।"

"কোন্ কলেজ ?"

মেয়েটি কলেজের নামও বললে।

কলেজের নাম শোনার পর মেয়েটির নাম জানতে রঘুনাথের আগ্রহ হ'ল ; বললে, "কিছু যদি মনে না করেন, আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করি।"

রঘুনাথের এই অসঙ্গত কৌতূহলের জন্যে মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল। না-হয় তুমি জোর ক'রে খানিকটা উপকারই করছ, তাই

ব'লে এমন ক'রে সেটা ষোল আনা পুষিয়ে নেওয়া নিতান্তই সুরুচি-বিরুদ্ধ। তবুও প্রশ্নটা তত বেশী অবৈধ নয় ব'লে বললে, "আমার নাম বসুদা।"

"বসুদা ? বসুদা কি ?"

বিরক্ত হ'য়ে মেয়েটি বললে, "বসুদা মুখোপাধ্যায়।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে অবস্থান ক'রে কতকটা যেন নিজমনেই রঘুনাথ বলতে লাগল, "বসুদা ! বসুদা মুখোপাধ্যায় ! ভারি মিষ্টি নাম ! যেমন চেহারা মিষ্টি তেমনি নাম মিষ্টি, যেমন নাম মিষ্টি তেমনি চেহারা মিষ্টি।"

ওদিকে পাশে চলতে চলতে রঘুনাথের ধৃষ্টতা দেখে ক্রোধে ও অপমানে বসুদা আরক্ত হ'য়ে উঠেছিল। কি ব'লে রঘুনাথকে তিরস্কৃত করবে তা ঠিক করতে পাচ্ছিল না ব'লেই বোধ করি সে চুপ ক'রে ছিল।

চলতে চলতে হঠাৎ এক সময়ে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বসুদার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে স্নিগ্ধকণ্ঠে রঘুনাথ ডাকলে, "বসুদা !"

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কঠোর স্বরে বসুদা বললে, "কি বলছেন ?"

তেমনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে রঘুনাথ বললে, "তোমার যদি আপত্তি না থাকে বসুদা, তা হ'লে আমি ষোল আনা রাজী আছি।"

"কিসে রাজী আছেন ?"

"তোমাকে বিয়ে করতে।"

বসুদার দুই চক্ষু ক্রোধে কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, "এই রকম ক'রে অপমান করবার জন্যেই তা হ'লে আপনি আমাকে সদর-রাস্তা থেকে নির্জন রাস্তায় টেনে এনেছেন ?"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে প্রসন্নমুখে রঘুনাথ বললে, "কি সুন্দর তুমি বসুদা! স্নিগ্ধ মূর্তিতেও তুমি যেমন সুন্দর, দীপ্ত মূর্তিতেও তুমি তেমনি সুন্দর! বিধাতার তুমি অপূর্ব সৃষ্টি!"

ঘৃণাতিক্ত কণ্ঠে বসুদা বললে, "ছি! ছি! আপনার লজ্জা করে না? রিক্‌শওয়ালাদের সঙ্গে আপনি তুলনা করছিলেন, কিন্তু রিক্‌শওয়ালারা আপনার চেয়ে ঢের ভদ্র; কোনও রিক্‌শওয়ালাই আপনার মত কদর্য কথা কয় না।"

বসুদার তীব্র তিরস্কার শুনে রঘুনাথ মৃদু মৃদু হাসতে লাগল; বললে, "তুমি ভুল করছ বসুদা। রিক্‌শওয়ালারা ত আর রঘুনাথ নয়, কিসের তাগিদে তারা এমন অদ্ভুত কথা বলবে বল? তোমাকে বসুদা মুখোপাধ্যায় ব'লে জানতে পারলে তারা কি আমার মতো এই রকম বিস্ময়ে আনন্দে পাগল হ'য়ে ওঠে? কখনই ওঠে না। বসুদা মুখোপাধ্যায় না হ'য়ে তুমি যদি কোন এক উর্মিলা চাটুজ্জে অথবা প্রমীলা গাঙ্গুলী হ'তে, তা হ'লে দেখতে আমি রিক্‌শওয়ালাদের চেয়ে কত বেশী ভদ্র হতাম।"

রঘুনাথের কথা শুনে প্রচণ্ড কৌতূহলে বসুদা রঘুনাথের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল।

বসুদার বিস্ময়াহত মুখের নির্বাক্ প্রশ্ন নির্ভুলভাবে পাঠ ক'রে রঘুনাথ সহাস্যমুখে বললে, "হ্যাঁ,—সত্যিই তাই। আমি রঘুনাথ বাঁড়ুজ্জে। না দেখে না শুনে তোমাকে অবহেলা করার অপরাধে অপরাধী। কিন্তু আগে ত জানতাম না যে, তুমি এমন—"

কিন্তু কার সাধ্য সে-সব কথা শেষ পর্যন্ত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

শোনে! দেখা গেল, কখন বসুদা ছাতা মাথায় ক'রে পিছন ফিরে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র এক পার্কের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়েছে!

"বসুদা! বসু!"

বসুদা নিস্তব্ধ।

এই বসুদার পিতামাতা রঘুনাথের হস্তে বসুদাকে সমর্পণ করবার জন্য সুদীর্ঘ কাল ধ'রে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। রঘুনাথের বিধবা মাতারও এ বিবাহে সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে, কিন্তু রঘুনাথের ধনুর্ভঙ্গ পণ বিলাত হ'তে লেখাপড়া শেষ না ক'রে এসে বিবাহ করবে না। তাই এ পর্যন্ত বসুদাকে দেখবার সকল প্রকার অনুরোধ উপরোধ সে অতিক্রম ক'রে এসেছে। যে সম্পদ নিজের ভাণ্ডারে সংগ্রহ করবার কোনো সঙ্কল্প নেই, তাকে যাচাই করবার জন্য তার বিপণিতে উপস্থিত হওয়া একেবারে অর্থহীন। আজ কিন্তু প্রকৃতির এবং দৈবশক্তির ষড়যন্ত্রে বৃষ্টিধারার মধ্যে তাদের দেখা—একছত্রের তলে তাদের সংযোগ।

রঘুনাথ ধনকুবের স্বর্গীয় হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের সে দীপ্তিমান ছাত্র; গণিতশাস্ত্রে রেকর্ড মার্ক অধিকার ক'রে এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে মুখে তার নাম; বিবাহ প্রস্তাবের পর থেকে বসুদা মনে-প্রাণে সেই নাম জপ করে।

ঠিক জপ করার কথা জানা না থাকলেও যে বসুদাও আগ্রহের সহিত তাকে কামনা করে, সে কথা রঘুনাথ বসুদার আত্মীয়বর্গের আগ্রহের প্রবলতা হ'তে সহজেই অনুমান করত। সুতরাং পরিচয় পাওয়ার পূর্বে অজানা অচেনা তরুণীকে অবলম্বন ক'রে যে নিষ্কাম এবং নিঃসত্ত্ব কাব্যটুকু জন্মগ্রহণ করেছিল, পরিচয় পাওয়ার পর আর তা সেরূপ রইল না।

তখন সেই নৈর্ব্যক্তিক কাব্য-পরিস্থিতির কেন্দ্রে বসুদা তার সমস্ত সত্তা নিয়ে দেখা দিলে। সুনিশ্চিত বিবাহের দ্বারা যে অপরাধকে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত করা চলবে, সে অপরাধ অপরাধই নয়। সুতরাং এই দৈবাগত অচিন্তিতপূর্ব সৌভাগ্যকে একটু নিবিড়তার সহিত উপভোগ করবার পক্ষে কোনো নৈতিক বাধা আছে ব'লে রঘুনাথ মনে করলে না।

বৃষ্টি অল্প একটু ক'মে এসেছিল। পিছন দিক হ'তে রঘুনাথ বললে, "আগে কে জানত বসুদা, এমন অদ্ভুত মেয়ে তুমি! আর এমন অদ্ভুত ভাবে দেখা দিয়ে, শুধু আমার ছাতার মধ্যেই নয়, একেবারে সোজা আমার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করবে!"

এ কথারও কোন উত্তর না দিয়ে বসুদা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

আকস্মিক বিস্ময় এবং সঙ্কোচজনিত বসুদার এই দুরপনেয় জড়তা দূরীভূত করবার জন্য রঘুনাথের মনে এক দুষ্ট বুদ্ধির উদয় হ'ল। কণ্ঠের স্বর যথাসম্ভব গম্ভীর ক'রে নিয়ে সে বললে, "এমনভাবে তোমার দাঁড়িয়ে থাকা ভাল হচ্ছে না কিন্তু বসুদা। পথে হয়ত তেমন লোক নেই, কিন্তু জানলায় জানলায় উৎসুক চোখেরও অভাব নেই। তারা নিশ্চয় মনে করছে, আমি তোমার কাছে এমন-একটা প্রস্তাব করেছি, যার জন্যে তুমি আমার সঙ্গে মুখোমুখী হ'তে ভয় পাচ্ছ।"

কি সর্বনাশ! চকিত হ'য়ে উঠে বসুদা সম্মুখে বাড়ীগুলোর উপর একবার ত্বরিত দৃষ্টি বুলিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হ'ল।

পিছনে চলতে চলতে রঘুনাথ ডাকলে, "বসুদা!"

বসুদা দাঁড়ালে না; শুধু গতি ঈষৎ মন্দ ক'রে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে।

রঘুনাথ বললে, "ও-রকম ক'রে তুমি আমার সামনে সামনে ছুটে চললে. লোকে আমাকে দুর্বৃত্ত ব'লে সন্দেহ করবে,—তুমি যে আমার পরমাত্মীয়, সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। দাঁড়াও।"

বসুদা গতি রোধ ক'রে দাঁড়াল।

মুহূর্তের মধ্যে বসুদার পাশে উপস্থিত হ'য়ে রঘুনাথ বললে, "আস্তে চল বসুদা। তোমাদের বাড়ীর দেড় হাত পথ ত শেষ হ'য়ে এল, তার ওপর ছুটোছুটি ক'রে আজকের এই বর্ষা-দিনের অপূর্ব কাব্যটুকুর অতি অল্প আয়ু আরও অল্প ক'রে দিয়ো না। লক্ষীটি, আস্তে আস্তে চল।"

বসুদা ধীরে ধীরে রঘুনাথের পাশে পাশে চলতে লাগল।

রঘুনাথ বললে, "বাড়ী গিয়ে তোমার মাকে আজ ব'লো বসুদা—রঘুনাথ বলেছে, বসুদাকে গৃহলক্ষী না ক'রে কোনো সরস্বতীরই কৃপালাভের লোভে সে গৃহত্যাগ করবে না।"

"বসু!"

অপাঙ্গে বসুদা রঘুনাথের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে; সে দৃষ্টির মধ্যে এখন আর পূর্বের কটুতা নেই, এখন তথায় লজ্জা এবং হর্ষের অপরূপ জড়াজড়ি।

সহাস্যমুখে রঘুনাথ বললে, "এবার ত বসু, তোমার ছাতার মধ্যে আমাকে আশ্রয় দিতে পার?"

ইতস্ততঃ তাকিয়ে দেখে আহ্বানসূচক অল্প একটু মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে আরক্ত মুখে বসুদা বললে, "আসুন।"

রঘুনাথ হাসতে লাগল; ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললে, "না, না, তার আর কাজ নেই। তোমার মন ভিজেছে এই যথেষ্ট, তোমার কাপড় ভেজাতে আর চাই নে।"

তারপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে বলতে লাগল, "দুঃখ নেই বসুদা। ভবিষ্যতে এই ছাতার তলায় বহুবার আমরা মিলিত হব। আকাশ জুড়ে মেঘ ঘনিয়ে এসে যখন বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করবে, তখন মাঝে মাঝে আমরা দুজনে এই ছাতার নীচে পাশাপাশি হ'য়ে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ব। এই ছাতা আমাদের মিলিত করেছে বসুদা,—আমাদের মিলনের প্রতীক এই ছাতাকে আমরা চিরদিন যত্নে আদরে রাখব।"

পর-মুহূর্তেই সহসা দাঁড়িয়ে প'ড়ে রঘুনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বসুদা বললে, "এইটে আমাদের গলি।"

কিন্তু গলির প্রবেশ-পথে রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জুড়ে এমন একটু জল জমেছিল যে, বসুদার পক্ষে সেটা ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জলের মধ্যে কোথাও একটু জাগা জমি অথবা ইঁট-পাথর আছে কি-না যার উপর জুতো রেখে পেরিয়ে যাওয়া যায়—সে বোধ হয় তাই লক্ষ্য করছিল, এমন সময় কানের কাছে মুখ এনে রঘুনাথ বললে, "কিছু যদি মনে না কর ত একটা কথা বলি।"

সামনের দিকেই মুখ সোজা ক'রে রেখে মৃদুস্বরে বসুদা বললে, "কি ?"

"দু হাতে তোমাকে তুলে ধ'রে টপ ক'রে পার ক'রে দিই।"

প্রস্তাব শুনে আরক্ত মুখে রঘুনাথের প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে বসুদা থলবলিয়ে জলের মধ্যে নেমে পড়ল। বা ভীষণ লোক, কিছুই অসম্ভব নয়! ম্যাথেম্যাটিক্সে রেকর্ড নম্বর পেলে কি হয়, কাজে-কর্মে কথায়-বার্তায় দারুণ বেহিসেবী!

এক লম্ফে জল পেরিয়ে বসুদার পাশে উপনীত হ'য়ে রঘুনাথ বললে, "লজ্জার জন্যে আমাদের অনেক ভাল জিনিস থেকে বঞ্চিত হ'তে হয় বসুদা। আমি যদি আজ আমি না হ'য়ে তুমি হতাম, তা হ'লে কখনই এই অত্যন্ত আদরের প্রস্তাবে অসম্মত হতাম না।"

এ কথাও যথেষ্ট বেহিসাবী কথা, সুতরাং বসুদা এ কথারও কোনো উত্তর দিলে না।

গলির মধ্যে খানিকটা অগ্রসর হ'য়ে বাঁ দিকে বসুদাদের বাড়ী। সদর-দরজার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে দুই ধাপ সিঁড়ির উপর উঠে বসুদা রঘুনাথের দিকে ফিরে দাঁড়ালে; তারপর ছাতাটা রঘুনাথের হাতে দিয়ে সলজ্জ মুখে বললে, "আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।"

বিস্মিত কণ্ঠে রঘুনাথ বললে, "ক্ষমা করব? কেন? অন্য কোনো লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে স্থির হ'য়ে গেছে না-কি?"

মাথা নাড়া দিয়ে বসুদা বললে, "সে কথা বলছি নে। আপনাকে আজ যে-সব অন্যায় কথা বলেছি তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।"

বসুদার কথা শুনে রঘুনাথের মুখে হাসি ফুটে উঠল; বললে, "এখন কি তা হ'লে রিক্‌শওয়ালাদের চেয়ে আমাকে কিছু ভদ্র ব'লে মনে হচ্ছে?"

"আমাকে ক্ষমা করুন।" বসুদার কণ্ঠস্বরে সুগভীর অনুতাপের করুণতা।

রঘুনাথ বললে, "না, না, বসুদা, তোমাকে ক্ষমা করবার কোনো কথাই উঠতে পারে না। যে-সব কথাকে তুমি অন্যায় কথা বলছ, সেই সব কথাই আমার জীবনে চিরদিনের মতো অমূল্য সম্পদ হ'য়ে রইল। সেই সব কথা শুনেই তোমাকে অমন অদ্ভুত মেয়ে মনে হয়েছিল। এখন অনুতাপ হচ্ছে, কেন অত শীঘ্র নিজের পরিচয় দিলাম! কেন আরও কিছুক্ষণ তোমার কাছ থেকে লাঞ্ছনা ভোগ করলাম না! তোমার কঠিন বাক্য কত যে মিষ্টি তার কোনো ধারণা নেই তোমার। তুমি এমনই অদ্ভুত গোলাপ যে, তোমার কাঁটার আঘাতেও আনন্দ আছে।"

তরুণ প্রেমের এই অপরূপ প্রাণ-ঢালা সোহাগ-ভাষণ বসুদার প্রণয়চকিত হৃদয়কে এক অপূর্ব সঙ্গীতে উদ্বেল ক'রে তুললে। সে

সঙ্গীতের যথার্থ ভাষা, 'তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি, সব সমর্পিয়া প্রাণ-মন দিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।' কিন্তু মুখ ফুটে কে সে কথা ভাষায় প্রকাশ ক'রে বলে!

বসুদা বললে, "আমার একটা কথা আছে।"

"কি বল?"

"এখানে আপনার পরিচয় দেবেন না।"

বিস্মিত কণ্ঠে রঘুনাথ বললে, "পরিচয় দোব না? কোনো দিন না?"

"না, আজ দেবেন না; এখন দেবেন না।"

সহাস্যমুখে রঘুনাথ বললে, "এখন ত এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি, সুতরাং আজকের ভয় তোমার নেই। কিন্তু কাল সকালে মাকে নিয়ে তোমার দরবারে হাজির হব। তুমি ত এখনো স্পষ্ট ক'রে তোমার সম্মতি জানাও নি বসুদা। কি বল? কাল আসব তো?"

আরক্ত মুখে মৃদুস্বরে বসুদা বললে, "আসবেন।" তারপর পিছন ফিরে দরজায় দু-চার বার ধাক্কা দিলে।

ভিতরে নিকটেই একজন চাকর কাজ করছিল, তাড়াতাড়ি এসে দোর খুললে।

"আচ্ছা, এবার তা হ'লে চললাম।" ব'লে রঘুনাথ দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে রঘুনাথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সকৃতজ্ঞ মনের সমস্ত মাধুরী দিয়ে মনে মনে রঘুনাথকে বন্দিত ক'রে পুলকিত-চিত্তে বসুদা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে দোর লাগিয়ে দিলে।

গৃহে প্রবেশ ক'রেই বাঁ দিকে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে বসুদার জননী সত্যবতী নেমে আসছিলেন। বসুদাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "হ্যাঁ রে, দোর লাগিয়ে দিলি, সে ছেলেটি কোথায় ?"

ঈষৎ বিমূঢ়ভাবে বসুদা বললে, "কে ?"

সত্যবতী বললেন, "ওপর থেকে জানলা দিয়ে দেখলাম একটি ছেলে নিজের ছাতা তোকে দিয়ে ভিজতে ভিজতে তোর পাশে পাশে আসছিল, তার কথা বলছি।"

বসুদা বললে, "তিনি বাড়ী চ'লে গেলেন।"

"কে সে ? কোথায় তার দেখা পেলি ?"

যুগ্ম প্রশ্ন ! প্রথমটির উত্তর দেওয়া নিরাপদ নয় ; বসুদা একেবারে দ্বিতীয়টির উত্তর দিয়ে বললে, "ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে।"

সত্যবতী বললেন, "আহা, অনেক দূর থেকে এসেছিল ত ! ভিজে কাপড়ে ফিরে না গিয়ে কাপড়-চোপড় বদলে একটু চা-টা খেয়ে গেলে ভাল হ'ত। চিনিস না-কি তাকে ?"

কঠিন প্রশ্ন। 'চিনি না' বললে, মিথ্যা ভাষণ হয় ; 'চিনি' বললে, পরবর্তী প্রশ্ন কঠিনতর মূর্তিতে দেখা দেয়। কি উত্তর দেবে বসুদা বিহ্বল হ'য়ে তাই ভাবছে, এমন সময় দৈব অনুকূল ব'লে মনে হ'ল। সদর-

দরজায় অকস্মাৎ করাঘাত শোনা গেল; প্রভাবতী বললেন, "সুধীর বোধ হয় কলেজ থেকে এল, দোর খুলে দে বসু।"

সুধীর বসুদার দাদা। সত্যবতীর কথা শুনে বসুদা উল্লসিত হ'ল—সুধীর যদি হয় ত তার হাতে জননীকে সমর্পণ ক'রে একেবারে এক ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া। তারপর, পরদিন সকাল পর্যন্ত কোনো রকমে গা ঢাকা দিয়ে দিয়ে সময় কাটিয়ে দেওয়া। অবশেষে জননীকে সঙ্গে নিয়ে রঘুনাথ যখন উপস্থিত হবে, তখন অপরিমেয় বিস্ময় এবং আনন্দের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান।

দোর খুলে দিয়ে কিন্তু বসুদা সচকিতে দুই পা পিছিয়ে এল। সুধীর ত নয়ই; সত্যবতীর কঠিন প্রশ্ন অপেক্ষাও কঠিনতর বস্তু,—অর্থাৎ, স্বয়ং রঘুনাথ দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তথাপি অন্তরের গোপন আনন্দ সমস্ত লজ্জা এবং বিমূঢ়তাকে পাশে ঠেলে নিঃশব্দে অধরপ্রান্তে এসে দেখা দিলে।

বসুদার পশ্চাতে সত্যবতীকে দেখতে পেয়ে রঘুনাথ সাবধান হ'য়ে গেল। বসুদার দিকে হাত বাড়িয়ে সহাস্যমুখে বললে, "আমার মনি-ব্যাগটা?"

কি সর্বনাশ! রঘুনাথকে বিদায় দেবার সময় বসুদা অন্যমনস্ক হ'য়ে মনিব্যাগের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল! আরক্তমুখে হাত বাড়িয়ে মনিব্যাগটা রঘুনাথকে প্রত্যর্পণ করলে।

সত্যবতী নিকটে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন; কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সবিস্ময়ে বললেন, "ওঁর মনিব্যাগ তোর কাছে কেমন ক'রে এল?"

বসুদা কিছু বলবার পূর্বে এ প্রশ্নের উত্তর দিলে রঘুনাথ; বললে,

"কাপড়ের ব্যাগ, ভিতরে কাগজের টাকা; ভিজে নষ্ট হওয়ার ভয়ে ওঁর কাছে ছাতার তলায় রাখতে দিয়েছিলাম।" ব'লে হাসতে লাগল।

বসুদার দিকে চেয়ে সত্যবতী বললেন, "কি মেয়ে রে তুই! ছাতা ত নিয়েইছিলি, তার ওপর মনিব্যাগটা নিয়ে ফিরিয়ে না দিয়ে ভিজে কাপড়েই ছেড়ে দিচ্ছিলি!"

বসুদার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করলে, "মা নিশ্চয়ই?"

বসুদা বললে, "হ্যাঁ।"

দরজা পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে রঘুনাথ সত্যবতীর পদধূলি গ্রহণ করলে।

রঘুনাথের আকৃতি এবং আচরণ দেখে সত্যবতী মনে মনে প্রসন্ন হয়েছিলেন; তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, "চিরজীবী হও।" তারপর স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, "এস বাবা, এস। ভিজে কাপড় বদলে, চা খেয়ে তারপর যাবে।"

প্রসন্ন মুখে রঘুনাথ বললে, "না মা, আজ যাই; কাল সকালে আবার আসব। তবে কাল একা আসব না, মাকে সঙ্গে নিয়ে আসব।" ব'লে বসুদার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে একটু হাসলে।

বিস্মিত হ'য়ে সত্যবতী বললেন, "সে ত খুবই সুখের কথা। কিন্তু তোমার মাকে নিয়ে আসবে কেন বল ত বাবা?"

রঘুনাথ বললে, "সে কথা এখন বললে বসুদার সঙ্গে চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধ হবে। পরে আপনি বসুদার কাছে সব শুনবেন।"

বসুদাকে দেখতে গিয়ে সত্যবতী দেখলেন, অদূরে বসুদা চ'লে যাচ্ছে। একবার মনে করলেন, ডেকে কথাটা জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু সম্ভবতঃ

বসুদাও এখন বলতে স্বীকৃত হবে না ভেবে রঘুনাথকে বললেন, "তুমি বসুদাকে আগে থেকে জান ?"

রঘুনাথ বললে, "জানি।"

"কত দিন থেকে ?"

একটু চিন্তা ক'রে রঘুনাথ বললে, "প্রায় আট-ন মাস থেকে।"

"আজ বসুদা তোমার কাছে গিয়েছিল ?"

ব্যগ্রকণ্ঠে রঘুনাথ বললে, "না, না, বসুদা আমার কাছে কোনো দিনই যায় নি। আজ কলেজ থেকে ফেরবার সময়ে বসুদা যখন ওয়েলিংটনের মোড়ে ট্রাম থেকে নামছিল, তখন সেই ট্রামে ওঠবার জন্যে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভয়ানক জোরে বৃষ্টি এল ব'লে বসুদাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে যাচ্ছি।" ব'লে রঘুনাথ পুনরায় বিদায় প্রার্থনা করলে।

এরূপ একটা দুর্ভেদ্য সমস্যার মধ্যে রঘুনাথকে সহসা ছেড়ে দিতে সত্যবতীর মন চাইলে না। তা ছাড়া, আর্দ্র বসন পরিবর্তন ক'রে চা খেয়ে যাবার জন্য অনুরোধ ত পূর্বেই করেছিলেন; বললেন, "না, না, সে কিছুতেই হবে না। এমন ভিজে কাপড়ে তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না।"

রঘুনাথ আরও খানিকটা আপত্তি করলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে রাজী হ'তেই হ'ল।

ভজুয়া চাকরকে ডেকে সত্যবতী নীচেকার বাথরুমে ধোয়া ধুতি, জামা ও গেঞ্জি দিয়ে রঘুনাথকে তথায় নিয়ে যাবার জন্যে আদেশ করলেন। তারপর, রঘুনাথ বাথরুমে প্রবেশ করলে কন্যার সন্ধানে

দ্বিতলে উপস্থিত হ'য়ে অবগত হলেন, বসুদাও দ্বিতলের বাথরুমে প্রবেশ করেছে।

কন্যা যে উপস্থিত তাঁরই হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বাথরুমে আশ্রয় নিয়েছে—এ কথা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হ'ল না। নীচে এসে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় চায়ের টেবিলের সম্মুখে আসন গ্রহণ ক'রে সত্যবতী দুশ্ছেদ্য চিন্তাজালের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

মিনিট পনের-কুড়ি পরে স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্তন ক'রে রঘুনাথ বাথরুম থেকে নির্গত হ'ল ; তারপর ভজুয়া কর্তৃক নীত হ'য়ে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় এসে আসন গ্রহণ করলে।

ভজুয়া প্রস্থান করলে সত্যবতী রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি বাবা ?"

বসুদার নিকট প্রতিশ্রুতি স্মরণ ক'রে রঘুনাথ বললে, "আমার নাম ? আমার নাম রামচন্দ্র। রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"তুমি কি কর ? পড় ?"

"হ্যাঁ, পড়ি।"

"কি পড় ?"

রঘুনাথ বলিল, "ল পড়ি।"

নির্বন্ধসহকারে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে সত্যবতী বললেন, "লক্ষ্মী বাবা ! তোমার মাকে কাল সকালে কেন নিয়ে আসবে, সে কথা আমাকে খুলে বল। আমার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে জানতে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে রঘুনাথ বললে, "আপনার কথা আমি অমান্য করতে পারলাম না,—কিন্তু আমি যে এ কথা আপনাকে বলেছি, সে কথা বসুদাকে অন্ততঃ আজকের দিনে বলবেন না।"

সত্যবতী বললেন, "আচ্ছা বলব না। তুমি বল।"

রঘুনাথ বললে, "মাকে নিয়ে আসব বসুদার সঙ্গে আমার বিয়ের দিন স্থির ক'রে যেতে।"

প্রচণ্ড বিস্ময়ে সত্যবতী বললেন, "বিয়ে স্থির করতে?—না, বিয়ের দিন স্থির করতে?"

রঘুনাথ বললে, "দিন স্থির করতে। অবশ্য আপনাদের যদি মত থাকে তা হ'লে।"

"তোমাদের মত আছে?—তোমার মত আছে?"

"আছে।"

"বসুদার?"

সত্যবতীর প্রশ্ন শুনে রঘুনাথ হেসে ফেললে; বললে, "মা, আপনি দেখছি বসুদার কাছে আমাকে অপ্রতিভ না ক'রে ছাড়বেন না। আছে।"

সত্যবতী জিজ্ঞাসা করলেন, "কবে তোমাকে সে তার মত জানিয়েছে?"

রঘুনাথ বললে, "আজ। একটু আগে।"

একটা কাঠের ট্রে ক'রে ভজুয়া চা ও খাবার নিয়ে উপস্থিত হ'ল।

সত্যবতী বললেন, "দিদিমণি কোথায়?"

ভজুয়া বললে, "দিদিমণি ত ওই ঘরে রয়েছেন।" ব'লে নিকটতম ঘরটা দেখিয়ে দিলে।

সবিস্ময়ে সত্যবতী বললেন, "ওই ঘরে রয়েছে? খুব মেয়ে যা হোক!" তারপর, 'বসুদা! বসুদা!' ব'লে নিজেই উচ্চকণ্ঠে ডাকতে লাগলেন।

বসুদা ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

সত্যবতী বললেন, "কি মেয়ে রে তুই! এখানে ব'স্,—রামচন্দ্রকে চা-টা খাওয়া।"

রঘুনাথের সহিত বসুদার চকিত দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। রঘুনাথের মুখে ফুটে উঠল কৌতুকের মৃদু হাসি, বসুদার মুখে সবিস্ময় পুলক।

নিকটে একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে মৃদুকণ্ঠে বসুদা বললে, "আমি চা ক'রে দোব?"

স্মিতমুখে বসুদার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে রঘুনাথ বললে, "বেশ ত, দাও।"

চিনি মেশাবার সময় ভজুয়াকে ডাকবার জন্য সত্যবতী অল্প একটু দূরে উঠে গিয়েছিলেন। রঘুনাথের দিকে তাকিয়ে বসুদা জিজ্ঞাসা করলে, "ক চামচে চিনি দোব?"

সহাস্যমুখে রঘুনাথ মৃদুকণ্ঠে বললে, "এক চামচে না দিলেও মিষ্টি লাগবে।"

রঘুনাথের কথা শুনে বসুদার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। চায়ের সঙ্গে দুই চামচে চিনি মিশিয়ে রঘুনাথের দিকে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিলে।

ফিরে এসে চেয়ারের উপর উপবেশন ক'রে সত্যবতী অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। বললেন, "তোমরা ক ভাই-বোন রামচন্দ্র?"

রঘুনাথ বললে, "আমার ভাই নেই, বোন তিনটি।"

পরিচয় গ্রহণের প্রসঙ্গ আরো কিছুক্ষণ চলার পর সদর-দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনা গেল।

নিকটেই ভজুয়া ছিল ; বললে, "দাদাবাবু কলেজ থেকে এলেন।" ব'লে দোর খুলে দিতে গেল। কিন্তু ক্ষণকাল পরে দাদাবাবুর পরিবর্তে দেখা দিলেন বসুদার পিতা দীননাথ।

নিকটে উপস্থিত হ'য়ে রঘুনাথের প্রতি সাগ্রহ এবং সবিস্ময় দৃষ্টিপাত ক'রে দীননাথ বললেন, "এ কি ! রঘুনাথ না ?"

সত্যবতী ঘাড় নেড়ে বললেন, "না, রঘুনাথ নয় ; রামচন্দ্র।"

দীননাথ ঘাড় নেড়ে বললে, "নিশ্চয়ই রঘুনাথ। রামচন্দ্র নয়।" রঘুনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "তুমি রঘুনাথ নও ?"

বিনীত কণ্ঠে রঘুনাথ বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি রঘুনাথ।"

সবিস্ময়ে সত্যবতী বললেন, "কোন্ রঘুনাথ ?"

দীননাথ বললেন, "যে রঘুনাথকে পাবার জন্যে তুমি দিবারাত্র দেবতার কাছে প্রার্থনা করছ, সেই রঘুনাথ।"

রঘুনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রবল আগ্রহে সত্যবতী জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ বাবা, সত্যি ?"

রঘুনাথ বললে, "সত্যি।"

"তবে যে বললে তোমার নাম রামচন্দ্র ?"

এ সমস্যার সমাধান করলেন দীনবন্ধু; সহাস্য মুখে বললেন, "রঘুনাথের অনেক নাম আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে রামচন্দ্র।"

বিস্ময়ে আনন্দে আপ্লুত হ'য়ে সত্যবতী ডাকলেন, "বসুদা !"

বসুদা কিন্তু পূর্বেই কথাবার্তার কোন্ ফাঁকে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

রাতজাগা

১৩৩৯ সালের শরৎকাল।

বিবাহের মাস তিনেক পরে শ্বশুর মহাশয়ের পল্লীনিবাস সোনাইদহে চলিয়াছি। সঙ্গে আছেন তৃতীয় শ্যালক অভয়পদ। আমাকে লইয়া যাইবার জন্য ইনি কলিকাতার গৃহে অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। বাকি সকলে,—মায় সেই ব্যক্তি, যাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সুদীর্ঘ দুর্গম পথ উৎসাহভরে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি,—পূর্বেই সোনাইদহে গমন করিয়াছেন।

রেল হইতে নামিতে আর অধিক বিলম্ব ছিল না। একটা স্টেশনের পরেই সোনাইদহর নিকটতম রেল-স্টেশন। তথা হইতে তিন মাইল অপ্রশস্ত কাঁচা পথ ভাঙিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে হইবে।

কথায় কথায় অভয়পদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের সোনাইদহে আকর্ষণের বস্তু কি আছে অভয়পদ?"

অভয়পদর মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "সোনাইদহে আকর্ষণের বস্তু? তবেই হয়েছে! একমাত্র বনজঙ্গল আর খানাডোবা ছাড়া এমন কোনো বস্তু সেখানে নেই, যা তোমাকে আকর্ষণ করতে পারে।"

মনে মনে বলিলাম, 'ভুল করছ অভয়পদ। আর কোনো বস্তু না না থাকলেও তোমার ভগ্নী নিশ্চয় আছেন, যাঁর আকর্ষণ আমার পক্ষে প্রচুর ব'লেই মনে করি।'

মুখে বলিলাম, "কোনো আকর্ষণের বস্তু যদি না-ই থাকে, তা হ'লে কোন্ সাহসে আমাকে সেখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছ?"

আমার কথা শুনিয়া অভয়পদ কিছু না বলিয়া শুধু একটু হাসিল। বোধ করি সঙ্কোচবশতঃ বলিতে পারিল না, ভগ্নীর সাহসে। কিন্তু অপর যে বস্তুর কথা সে অসঙ্কোচে বলিতে পারিত, হয় তাহা বলিতে ভুলিয়াই গেল, অথবা তাহার দৃষ্টিতে সে বস্তুকে সে উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করে না।

আমি কিন্তু বর্তমান কাহিনীতে সেই দ্বিতীয় বস্তুর কথাই বলিব।

স্টেশনে নামিয়া দেখিলাম, আমাদের লইয়া যাইবার জন্য লাঠি এবং লণ্ঠন হস্তে দুইজন পাইক, দুইখানা পালকি, এবং আসবাবপত্রের জন্য একখানা গরুর গাড়ী আসিয়াছে।

শুক্লা চতুর্থীর ক্ষীণ চন্দ্রমা বহুক্ষণ অস্তমিত হইয়াছে। তিমির বৃত প্রান্তরের বক্ষ ভেদ করিয়া সেই অপ্রশস্ত গ্রাম্যপথের উপর দিয়া বাহিত হইয়া আমরা সোনাইদহের অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

নিস্তব্ধ পল্লীজননীর নিদ্রালস রাজ্যে পালকি-বেহারাদের পথশ্রমনাশক ছড়ার গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে এবং পালকির দোলা খাইতে খাইতে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম মনে নাই, অভয়পদর ডাকে জাগ্রত হইয়া দেখিলাম, পালকি ভূমিতলে অবস্থান করিতেছে।

পালকি হইতে বাহির হইতে হইতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পৌঁছেছি না-কি অভয়পদ?"

অভয়পদ বলিল, "প্রায়।"

বাহির হইয়া দেখিলাম, আমাদের অগ্রগতির পথ নির্বাধ নহে। সন্ধ্যার পর ঝড় হইয়াছিল, তাহার ফলে একটা জীর্ণ শিমূলবৃক্ষ পথ জুড়িয়া পড়িয়া আছে। রাত্রিকালে সম্পূর্ণরূপে পথ পরিষ্কার করিবার সুবিধা হইয়া উঠে নাই; শুধু এক দিকের ডালপালা কিছু কাটিয়া এবং কিছু সরাইয়া কোনো প্রকারে পদব্রজে যাতায়াতের একটু ব্যবস্থা হইয়াছে। শুনিলাম, সেখান হইতে শ্বশুরালয় মাত্র তিন-চার মিনিটের পথ।

চলিতে চলিতে অভয়পদর নিকট অবগত হইলাম, গ্রামের ভিতর দিয়াই যাইতেছি; কিন্তু তাহার কোনো পরিচয় পাইতেছিলাম না। পথের দুই পার্শ্বে গাছপালার সহিত জড়িত হইয়া গৃহস্থের ঘরবাড়ী যাহা আছে, সুনিবিড় অন্ধকার এবং সুগভীর নিদ্রাবেশের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে অবলুপ্ত। কোনো গৃহের সামান্য একটু অন্তরাল ভেদ করিয়াও ক্ষীণতম দীপালোকও দেখা যাইতেছিল না, অথবা অস্ফুটতম কণ্ঠস্বরও শুনা যাইতেছিল না। শুধু পদতলাশ্রিত নিশ্চেতন পথ আমাদের কয়েকজনের পদপীড়নে কাতরোক্তি করিয়া করিয়া চতুর্দিকের প্রগাঢ় স্তব্ধতাকে খণ্ডিত করিতেছিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, অদূরে পথের বাম পার্শ্বে একটা ঘরে আলো জ্বলিতেছে। বলিলাম, "ঐটে তোমাদের বাড়ি না-কি অভয়পদ?"

অভয়পদ বলিল, "না, ওটা রজনী বউদিদির বাড়ী। আমাদের বাড়ী ও-বাড়ীর আরও গোটা তিনেক বাড়ী পরে।"

নিকটে আসিয়া দেখিলাম, কক্ষটি একেবারে পথের ধারে অবস্থিত; সম্ভবতঃ গৃহের বৈঠকখানা হইবে। কক্ষের ভিতর জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া একটি ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী স্ত্রীলোক; পরিধানে চওড়া লালপাড় শাড়ী; কণ্ঠের সোনার হার এবং দুই হস্তের সোনার চুড়ি কেরোসিন লণ্ঠনের স্তিমির আলোকেও চিক্‌চিক্ করিতেছে।

রাত্রি এগারটার সময়ে পথপার্শ্বে জানালার ধারে একটি স্ত্রীলোককে এমন ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম।

স্ত্রীলোকটি বলিলেন, "কি অভয়, তোমরা এলে না-কি?"

অভয়পদ বলিল, "হ্যাঁ বউদি, এলাম।"

"জামাই এসেছেন ত?"

"এসেছেন।"

"এক মিনিট দাঁড়াও ত ভাই, জামাইকে একবার ভাল ক'রে দেখে আসি।" বলিয়া লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বাঁশচিতার বেড়ার মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ গেট খুলিয়া সীলোকটি পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর আপাদমস্তক আমাকে একবার দেখিয়া লইয়া প্রসন্নকণ্ঠে বলিলেন, "খাসা জামাই হয়েছে অভয়পদ, রূপেগুণে খাসা জামাই হয়েছে। গুণের কথা ত শুনেইছিলাম, দেখতেও ভারি চমৎকার।"

আমার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অভয়পদ মৃদুস্বরে বলিল, "রজনী বউদিদি। প্রণাম কর।"

অভয়পদর কথা শুনিয়া আমি নত হইয়া রজনী বউদিদিকে প্রণাম করিলাম।

ক্ষণিকের জন্য আমার মাথার উপর হাত রাখিয়া রজনী বউদিদি নিঃশব্দে আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। তাহার পর আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "শিমুলগাছটার জন্য আজ কিন্তু তোমাকে ভারি কষ্ট পেতে হ'ল।"

আমি বলিলাম, "না বউদিদি, এমন কিছু কষ্ট পেতে হয় নি।"

সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রজনী বউদিদি সহাস্যমুখে বলিলেন, "ঐ তোমার শ্বশুরবাড়ী থেকে আলো-টালো নিয়ে অনেকে তোমার জন্যে আসছেন। আচ্ছা, এস ভাই, রাত অনেক হয়েছে, খাওয়া-দাওয়া

ক'রে শুয়ে পড়গে। কাল সকালবেলা তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব অখন।"

"নিশ্চয় যাবেন।" বলিয়া আমরা প্রস্থান করিলাম।

কয়েক পদ অগ্রসর হইবার পর পিছন হইতে রজনী বউদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ অভয়পদ, স্টেশনে আর কাউকে গাড়ি থেকে নামতে দেখলে কি?"

চলিতে চলিতে অভয়পদ বলিল, "না, বউদিদি, আর কেউ নামে নি।"

"তা হ'লে পরের গাড়িতে হয়ত আসবেন।" বলিয়া রজনী বউদিদি গেট সরাইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

জানালার গরাদ ধরিয়া রজনী বউদিদিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কিছু পূর্বে মনের মধ্যে যে বিস্ময় জাগিয়াছিল, অভয়পদর সহিত তাঁহার এইটুকু কথোপকথন শুনিয়া তাহা অন্তর্হিত হইল। বুঝিলাম, ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া রজনী বউদিদি কোনো আত্মীয় ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সে দিনের মতো রজনী বউদিদির কথা বিস্মৃত হইলাম।

পরদিন বেলা নয়টার সময়ে আমাকে কেন্দ্র করিয়া একটি সুবৃহৎ বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছিল। বৈঠকে বাড়ীর প্রায় সকলে ত ছিলেনই, প্রতিবেশিনীদের মধ্যেও কেহ কেহ যোগ দিয়াছিলেন।

কিছুদিন পূর্বে কোন-এক জয়গোবিন্দ ঘোষের গৃহে সদ্যবিবাহিত চতুর কলিকাতাবাসী জামাতাকে কেমন করিয়া ঠকাইয়া নাকালের চূড়ান্ত করা হইয়াছিল, জনৈক রঙ্গপ্রিয়া ললনা সাড়ম্বরে সেই কাহিনী বিবৃত করিতেছিলেন, এমন সময়ে কক্ষের দরজার দিকে সকলের আকৃষ্ট হইল।

চাহিয়া দেখিলাম, দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক লাবণ্যময়ী রমণী। আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই রমণীর মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। হাসি দেখিয়া উৎকট বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গেলাম। ঠিক সেই হাসিই ত গত রাত্রে রজনী বউদিদির মুখে দেখিয়াছিলাম। তবে কি এই রমণীই রজনী বউদিদি?

কিন্তু তাই যদি হয়, তাহা হইলে অকস্মাৎ এ কি অদ্ভুত রূপান্তর! সীমন্তে সিঁদুর নাই, অঙ্গে আভরণ নাই, পরিহিত বস্ত্রে পাড় নাই! এ যে একেবারে পরিপূর্ণ বৈধব্যের শুচিশুভ্র মূর্তি! গত রজনীর প্রাসাধনরম্যা রজনীবালা আজ যেন বর্ষাপ্রভাতের রজনীগন্ধা হইয়া দেখা দিয়াছে।

মনে সংশয় হইল, হয়ত বা ইনি রজনী বউদিদির বিধবা ভগ্নীই হইবেন। কিন্তু পরক্ষণেই সংশয়ের নিরসন হইল, যখন আমার এক

শ্যালিকা 'রজনী বউদিদি' বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। সংশয় গেল; কিন্তু সমস্যা ঘনীভূত হইল।

রজনী বউদিদি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই একটি তরুণী তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া রজনী বউদিদিকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রজনী বউদিদি কিন্তু বসিলেন না, বাম হস্তের চাপে তরুণীকে তাঁহার পরিত্যক্ত স্থানে বসাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

মনে হইল, সকলেই রজনী বউদিদিকে বেশ একটু শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম করে।

কথাবার্তার মধ্যে এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাল রাত্রে কি তিনি এসেছেন বউদিদি?"

আমার প্রশ্ন শুনিয়া রজনী বউদিদির মুখে সুস্পষ্ট বিহ্বলতা দেখা দিল; সসঙ্কোচে বলিলেন, "কে?"

বুঝিলাম যে কারণেই হউক, এ প্রশ্ন করা আমার উচিত হয় নাই। কিন্তু তখন আর উপায়ান্তর ছিল না; কুণ্ঠিত স্বরে বলিলাম, "যাঁর জন্যে আপনি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন?"

রজনী বউদিদির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত নির্বাক থাকিয়া আর্তকণ্ঠে বলিলেন, "তাই কখনো আসেন বসন্ত! ও আমার একটা মনের খেয়াল! একটা পাগলামি!"

প্রসঙ্গটা পরিবর্তিত করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ অন্য কথা পড়িলাম। কিন্তু রজনী বউদিদি অধিকক্ষণ রহিলেন না, দুই-চার মিনিট কথা কহিয়াই প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, পুনরায় দেখা হইবে।

উগ্র কৌতূহল সহকারে আমার জ্যেষ্ঠা শ্যালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ব্যাপার বলুন ত বড়দি ?"

জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা হেমনলিনী বলিলেন, "ও এক অদ্ভুত ব্যাপার। দিনের বেলায় রজনী বউদিদি পুরোদস্তুর বিধবা, কিন্তু সূর্যাস্তের পর থেকেই তিনি ধীরে ধীরে তাঁর বৈধব্যের কথা অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন। রাত্রি আটটা সাড়ে-আটটার মধ্যে তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়, তাঁর স্বামী—বিভূতিদাদা বেঁচে আছেন। তখন তিনি বিধবার বেশ পরিত্যাগ ক'রে সধবার বেশ ধারণ করতে আরম্ভ করেন। মাথায় সিঁদুর পরেন, পায়ে আলতা পরেন, গায়ে অলঙ্কার পরেন, পাড়ওয়ালা শাড়ি পরেন। তারপর দশটা আন্দাজ খানিকক্ষণ স্থির হ'য়ে উত্তর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর কলকাতা থেকে প্রথম গাড়িতে লোক আসবার সময় থেকে লণ্ঠন জ্বেলে বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিভূতিদাদার অপেক্ষায় সমস্ত রাত কাটিয়ে দেন। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ধীরে ধীরে রাত্রের মোহ কাটতে আরম্ভ করে। তখন আবার সিঁদুর মোছা আর আলতা ধোয়ার পালা আরম্ভ হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রজনী বউদিদি আবার যে বিধবা সেই বিধবা।"

রজনী বউদিদির অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু রজনী বউদিদির স্বামীর আসল খবর কি ? বেঁচে নেই তিনি নিশ্চয়ই ?"

হেমনলিনী বলিলেন, "বিভূতিদাদা ? খুব সম্ভবতঃ তিনি বেঁচে নেই। কিন্তু নিশ্চয়ই বেঁচে নেই, তাও বলা যায় না,—কারণ মারা গেছেন সে কথাও নিশ্চয় ক'রে জানা যায় নি।"

ঔৎসুক্যসহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার মানে ?"

হেমনলিনী বলিতে লাগিলেন, "বিভূতিদাদা লক্ষ্ণৌয়ে আর্মি অর্ডন্যান্সে চাকরি করতেন। সেইখানেই রজনী বউদিদির সহিত পরিচয় হওয়ার পর তাঁকে তিনি বিয়ে করেন। দু বৎসর বিভূতিদাদার সঙ্গে রজনী বউদিদি পরম সুখে বাস করেন। তাঁদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার তুলনা ছিল না। শুনেছি লক্ষ্ণৌর বাঙালীরা তাঁদের দুজনকে কপোত-কপোতী নাম দিয়েছিল। তারপর আরম্ভ হ'ল সর্বনেশে জার্মান যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে বিভূতিদাদাদের অফিসের একটা অংশ মেসোপোটেমিয়ায় গেল,—তার সঙ্গে যেতে হ'ল বিভূতিদাদাকেও। যাবার আগে বিভূতি-দাদা রজনী বউদিদিকে এখানকার বাড়ীতে রেখে যান। তখন রজনী বউদিদির বৃদ্ধ শ্বশুর আর এক বিধবা পিসশাশুড়ী ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। বিভূতিদাদার মেসোপোটেমিয়া যাবার মাস দুয়েক পরেই, ছেলের দুঃখেই বোধ হয়, বিভূতিদাদার বাবা মারা যান ; পিসিমা মারা যান বছর পাঁচেক পরে। মেসোপোটেমিয়া যাওয়ার মাস দশেক পরে বিভূতিদাদা রজনী বউদিদিকে চিঠি লিখে জানান যে, তিনি ছ মাসের ছুটি পেয়েছেন ; আর যে তারিখে রাত্রি এগারোটার সময়ে তিনি সোনাদহে পৌঁছবেন, তাও সেই চিঠিতে ঠিক ক'রে লিখে পাঠান। কাল রাত্রে তুমি রজনী বউদিদিকে যেমন ভাবে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে

দেখেছ, পনের-ষোল বৎসর আগে বিভূতিদাদার আসবার দিনে তিনি ঠিক তেমনি ক'রেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু সেদিন ত বিভূতিদাদা এলেনই না; তার পরও এ পর্যন্ত কোন দিনই আসেন নি। অথচ সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই পনেরো-ষোল বৎসর বিভূতিদাদার প্রত্যাশায় রজনী বউদিদি প্রত্যেক রাত্রি জেগে কাটিয়েছেন—তা শীতই বল আর গ্রীষ্মই বল, বর্ষাই বল আর বাদলই বল। সেই জন্যে এ তল্লাটে ওঁর নামই হ'য়ে গেছে 'রাতজাগা রজনী'।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু বিভূতিবাবু মারা গেছেন, কি বেঁচে আছেন, সে কথা ত বেশি দিন অজানা থাকবার কথা নয় বড়দি। আমি অফিস সে কথা নিশ্চয় জানিয়ে দেবে। তা ছাড়া, বিভূতিবাবু যদি মারা গিয়ে থাকেন, তা হ'লে রজনী বউদিদির কম্পেন্সেশন্ পাওয়ার কথাও এর মধ্যে জড়িত আছে।"

হেমনলিনী বলিলেন, "এ সমস্ত কথা ঠিকই বলছ তুমি; কিন্তু রজনী বউদির সঙ্গে এ সব কথার আলোচনা করবার সাহসই বা কার আছে, আর গরজই বা কার বল? বিভূতিদাদা নিখোঁজ হওয়ার পর রজনী বউদিদির এক কাকা কয়েকবার এখানে যাতায়াত করেছিলেন। বিভূতি-দাদা যে অফিসে কাজ করতেন সেই অফিসের তিনি একজন বড় কর্মচারী। প্রথমবার তিনি রজনী বউদিদিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাথর হ'য়ে রজনী বউদিদি এক পা-ও তাঁর বাড়ী ছেড়ে নড়তে চাইলেন না। শোনা যায়, তারপর রজনী বউদিদির কাকা কি সব কাগজপত্রে রজনী বউদিদিকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে যান। কেউ কেউ বলে, সেই সব কাগজপত্রই কম্পেন্সেশন পাওয়ার কাগজপত্র।

টাকাটা বার ক'রে হয় তিনি রজনী বউদিদির নামে জমা ক'রে দিয়েছেন, নয় আত্মসাৎ করেছেন।"

আমি বলিলাম, "সে যা হয় হোক, কিন্তু রজনী বউদিদি যদি তাঁর স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ সঠিক না পেলেন তা হ'লে দিনের বেলাই বা তিনি বৈধব্য অবলম্বন করেন কেন ?"

হেমনলিনী বলিলেন, "বারো বৎসর পর্যন্ত তিনি একেবারেই বৈধব্য অবলম্বন করেন নি। বারো বৎসর উত্তীর্ণ হ'লে স্বামীরই কল্যাণের জন্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তিনি শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বিভূতিদাদার কুশপুত্তলী দাহ আর শ্রাদ্ধ করিয়ে বিধবা হন। কিন্তু শ্রাদ্ধের দিনের রাত্রেও তিনি বিধবার সজ্জা পরিত্যাগ ক'রে সধবার বেশ ধারণ করেছিলেন। বিভূতিদাদার শ্রাদ্ধের দিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি দিনের বেলা আটটা সাড়ে-আটটা থেকে চারটে সাড়ে-চারটে পর্যন্ত দেহে মনে ষোল আনা বিধবা, আবার রাত্রি আটটা সাড়ে-আটটা থেকে শেষ রাত্রি চারটে সাড়ে-চারটে পর্যন্ত দেহে মনে ষোল আনা সধবা।"

ক্ষণকাল গভীর বিস্ময়ের সহিত রজনী বউদিদির কাহিনী মনে মনে আলোচনা করিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, আপনি যে বললেন, প্রত্যহ রাত্রি দশটার সময়ে রজনী বউদিদি উত্তর মুখে খানিকক্ষণ স্থির হ'য়ে তাকিয়ে থাকেন, সে ব্যাপারটা কি ?"

হেমনলিনী বলিলেন, "সে কথা কেউ বলতে পারে না। বোষ্টমপাড়ার সরলাদিদির সঙ্গে রজনী বউদিদির সকলের চেয়ে বেশি অন্তরঙ্গতা।

তাঁকে পর্যন্ত রজনী বউদিদি ও-কথা বলেন নি। সরলাদিদি পেড়াপিড়ি করলে 'খেয়াল' 'পাগলামি' ব'লে কথাটা উড়িয়ে দেন।

মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এ রহস্য ভেদ করিতেই হইবে।

দুই-তিন দিনের মধ্যেই রজনী বউদিদির সঙ্গে একটা হৃদ্যতা স্থাপন করিতে সমর্থ হইলাম। চার-পাঁচ দিনের মধ্যে সেই হৃদ্যতা অন্তরঙ্গতায় পরিণত হইল। রজনী বউদিদির গৃহ হইল আমার পক্ষে অবারিতদ্বার। মনে মনে কেমন বিশ্বাস হইল, বোষ্টমপাড়ার সরলাদিদিকে পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া গিয়াছি।

পূজার কয়েক দিনই বৈকালের দিকে রজনী বউদিদির গৃহে আমার চা-পানের নিমন্ত্রণ থাকিতেছিল। দশমীর দিন সন্ধ্যার পর প্রণাম করিতে গিয়া রজনী বউদিদির নিকট হইতে পরদিন রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ আদায় করিয়া আসিলাম। রজনী বউদিদির ইচ্ছা ছিল, দ্বাদশীর দিন দ্বিপ্রহরে আমাকে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু আমি বলিয়া-কহিয়া নিমন্ত্রণটা একক এবং একাদশীর দিন রাত্রে করাইলাম।

রজনী বউদিদি স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু বলিলেন, "তা হ'লে তুমি সকাল সকাল এসো বসন্ত,—নটার মধ্যেই তোমাকে খাইয়ে দেব। পাড়াগাঁয়ে রাত বেশি হ'লে তোমার অসুবিধে হবে।"

পরদিন সকাল সকালই গেলাম। কিন্তু রজনী বউদিদি যখন খাবারের কথা বলিলেন, আপত্তি করিলাম; বলিলাম, "তাই কখনো হয় বউদিদি? সমস্ত দিন অভুক্ত থেকে সঙ্কল্প ক'রে তীর্থভূমিতে এসেছি—"

আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বিস্মিত কণ্ঠে রজনী বউদিদি বলিলেন, "সমস্ত দিন তুমি অভুক্ত আছ বসন্ত?"